গীত-উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
১৩৩৮

দাম একটাকা মাত্র

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী

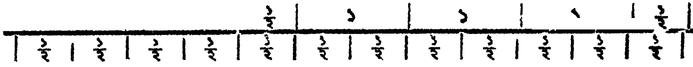
দ্বিতীয় খণ্ড

গীত-উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

'গীত-উপক্রমণিকা'র প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, সাতটি স্বরের অন্তর সমান নহে। স স্বর হইতে চড়া স স্বর পর্য্যন্ত পাঁচটি পূর্ণান্তর ও দুইটি অর্দ্ধান্তরবিশিষ্ট সাতটি স্বর আমরা প্রথমে পাইয়া থাকি। পরে, পূর্ণান্তরগুলিকে অর্দ্ধান্তরবিশিষ্ট করিয়া আরও পাঁচটি বিকৃত স্বর, মোট বারটি সমান অন্তরবিশিষ্ট স্বর পাওয়া গিয়াছে।



স রো র গো গ ম মী প ধো ধ নো ন র্স

এইরূপ অন্তরবিভাগই প্রথমে দেখান হইয়াছে। ইহা হারমোনিয়মের কী-বোর্ড (key-board) অনুযায়ী। কিন্তু তাহা প্রকৃতিগত স্বর-অন্তর নহে। প্রকৃত স্বর-অন্তর কিরূপ এবং ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ কিরূপভাবে স্বর-অন্তর ধরিয়া থাকেন তাহা এখানে দেখাইব।

একটা এস্রাজের বা বেহালার বা ঐরূপ ধনুযন্ত্রের স পর্দ্দা হইতে অন্য কোন পর্দ্দার উপর না থামিয়া অতি ধীরে চড়ার দিকে যাইতে থাকিলে যে-ধ্বনি বাহির হয় তাহা যেন একটা ধ্বনি-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ যে-সকল স্বর একটানাভাবে বাজিবে তাহাকে একটা স্বরের রেখা মনে হয়। কিন্তু রেখা বলিতে আমরা কি বুঝি? বিদ্যালয়ে শিক্ষকমহাশয় যদি একদিন প্রশ্ন করিয়া বসেন, 'ওহে, রেখা কি তাহা লিখিয়া দেখাও।' তখন খাতায় একটা লম্বা রেখা টানিয়া 'মাষ্টার মশাই, ইহাকেই রেখা বলে' বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু রেখা কতকগুলি পর পর সংলগ্ন সূক্ষ্ম বিন্দুর সমষ্টিমাত্র। ধ্বনি-রেখা বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ধ্বনির পর পর সংলগ্ন সূক্ষ্ম বিন্দুর সমষ্টিই ধ্বনি-রেখা। ইহাকে নাদবিন্দুও বলা হয়। কারণ ধ্বনির

শ্রুতি কি

অপর নাম নাদ। এই ধ্বনি-বিন্দুকেই শ্রুতি বলে। সাধারণতঃ সুরের সূক্ষ্ম অংশই শ্রুতি বলিয়া কথিত হয়।

স সুর হইতে তাহার অষ্টম সুর চড়া স সুর পর্য্যন্ত যে ধ্বনি-রেখা পাওয়া যায় তাহাকে প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ বাইশটি সূক্ষ্ম সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বাইশটি শ্রুতি ব্যবহার করা কষ্টকর হয় বলিয়া উহা মোটামুটি সাতটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই সাতটি ভাগই সাতটি সুর। তাহাদের নাম যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ইহাদের পরিচয় প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতিগত সাতটি সুর যেভাবে সজ্জিত আছে সেইভাবে সজ্জিত না করিয়া যদি সুরগুলির অন্তর সব সমান করা হয় তবে গীত শ্রুতিমধুর হয় না। সুরগুলি নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান করিবার রীতি উত্তম হয় না। এইজন্যই ধ্বনি-রেখা সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত হয় নাই।

যাই হউক, ধ্বনি-রেখাকে সূক্ষ্ম সমান শ্রুতিতে ভাগ করিয়া প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ দেখাইয়াছেন যে, স্বাভাবিক স্বরগ্রামে সাতটি সুরের অন্তরগুলির কোনটিতে চারটি, কোনটিতে তিনটি ও কোনটিতে দুইটি শ্রুতি (ধ্বনি-বিন্দু) রহিয়াছে।

শ্রুতিবিভাগ কিরূপ

স হইতে র-এর অন্তরে চারিটি শ্রুতি রহিয়াছে। আবার র হইতে গ-এর অন্তরে তিন শ্রুতি এবং গ হইতে ম-এর অন্তরে দুই শ্রুতি রহিয়াছে। সেইরূপ ম হইতে প-এর অন্তর চারি শ্রুতি, প হইতে ধ-এর অন্তর চারি শ্রুতি, ধ হইতে ন-এর অন্তর তিন শ্রুতি ও ন হইতে চড়া স-এর অন্তরে দুই শ্রুতি আছে। যথা :—

স র গ ম প ধ ন র্স

' 0 0 0 0 ' 0 0 0 ' 0 0 ' 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 ' 0 0 0 ' 0 0 '

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	
৪	৩	২	৪	৪	৩	২	=২২

শ্রুতিহিসাবে স্বর-অন্তর তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন,—বৃহদন্তর, মধ্যান্তর ও ক্ষুদ্রান্তর। শ্রুতিহিসাবে স্বর-অন্তর

স	হইতে	র	বৃহদন্তর
ম	,,	প	
প	,,	ধ	
র	হইতে	গ	মধ্যান্তর
ধ	,,	ন	
গ	,,	ম	ক্ষুদ্রান্তর
ন	,,	চড়া স	

প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে হারমোনিয়মের কী-বোর্ড অনুযায়ী আমরা বৃহদন্তর ও মধ্যান্তরকে পূর্ণান্তরই জানিয়াছি। হারমোনিয়মের বৃহদন্তর ও মধ্যান্তর স্বরগুলি ঈষৎ উঁচু-নীচু করিয়া লইয়াছে। এইজন্য ইহা ভুল। শ্রুতি-হিসাবে স্বরগ্রামই প্রকৃত স্বরগ্রাম।

শ্রুতিগুলির এক-একটা নাম আছে। যথা :— শ্রুতির নাম

ষড়্জ	(১)	তীব্রা
	(২)	কুমুদ্বতী
	(৩)	মন্দা
	(৪)	ছন্দোবতী
ঋষভ	(৫)	দয়াবতী
	(৬)	রঞ্জনী
	(৭)	রতিকা
গান্ধার	(৮)	রৌদ্রী
	(৯)	ক্রোধী
মধ্যম	(১০)	বজ্রিকা
	(১১)	প্রসারিণী
	(১২)	প্রীতি
	(১৩)	মার্জ্জনী

পঞ্চম	(১৪)	ক্ষিতি	ধৈবত	(১৮)	মদন্তী
	(১৫)	রক্তা		(১৯)	রোহিণী
	(১৬)	সন্দীপনি		(২০)	রম্যা
	(১৭)	আলাপিনী	নিষাদ	(২১)	উগ্রা
				(২২)	শোভিনী

ঔড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ

রাগরাগিণীতে সব কয়টি স্বরই সব সময়ে ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন রাগে সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হইতেছে। কোন কোন রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হইতেছে, আবার কোন কোন রাগে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হইতেছে। পাঁচ, ছয়, সাত এই তিনটি পর্য্যায় দ্বারা রাগরাগিণীকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল রাগে পাঁচটি স্বর লাগে, যে-কোন দুইটি স্বর একেবারেই লাগে না তাহাকে ঔড়ব বলে। যে সকল রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয় আর যে-কোন একটি স্বর একেবারেই লাগে না তাহাকে খাড়ব বলে। আর যে সকল রাগে সাতটি স্বরই ব্যবহার করা হয় তাহাকে সম্পূর্ণ বলে।

ঔড়ব ও খাড়ব রাগের তালিকা

নীচে প্রচলিত ঔড়ব, খাড়ব, রাগরাগিণীর নাম এবং তাহাদের কোন কোন্ স্বর বর্জ্জিত তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

ঔড়ব রাগরাগিণী

মধুমাত সারঙ্গ	গ,	ধ	বর্জ্জিত
বৃন্দাবনী সারঙ্গ	গ,	ধ	,,
দুর্গেশ্বরী	গ,	ন	,,
সামন্ত সারঙ্গ	গ,	ন	,,
দুর্গা	গ,	ন	,,
মালকোশ	র,	প	,,
চন্দ্রকোশ	র,	প	,,
হিন্দোল	র,	প	,,

শুভাবতী	র	প	বর্জ্জিত
মাল শ্রী	র,	ধ	„
ভূপালী	ম,	ন	„
বাঙ্গালী*	ম,	ণ	„
বেহাগ*	র,	ধ	„

খাড়ব রাগরাগিণী

বিভাস	ম	বর্জ্জিত
দেশকার	ম	„
লক্ষ্মী তোড়ী	ম	„
নচারী তোড়ী	র	„
বাহাদুরী তোড়ী	প	„
সূহা তোড়ী	ম	„
পুরিয়া	প	„
মারওয়া	প	„
জয়ন্ত	প	„
কুমারী	ধ	„
সাজগিরি	র	„
সরস্বতী	প	„
সুর মল্লার	গ	„
মেঘ	ধ	„
বসন্ত	প	„
পঞ্চম বা দীপক	প	„
বেহাগড়া	র	„

* মতান্তরে সম্পূর্ণ

ললিত	প	বর্জ্জিত
সোহিনী	প	,,

এই রাগরাগিণী ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত রাগরাগিণীগুলি সম্পূর্ণ-শ্রেণীভুক্ত।

ঔড়ব-সম্পূর্ণ

কোন কোন রাগে আরোহণে ঔড়ব আবার অবরোহণে সম্পূর্ণ বা খাড়ব হইয়া থাকে। যেমন দেশ রাগিণীতে আরোহণে গ, ধ বর্জ্জিত। কাজেই আরোহণে ঔড়ব, আবার অবরোহণে সব কয়টি স্বুরই ব্যবহৃত হয়। অতএব সম্পূর্ণ। এইরূপ রাগকে সম্পূর্ণই বলা হয়। কারণ কোন-না-কোন সময়ে সাতটি স্বুর লাগিতেছে; তবে এইরূপ রাগকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ বলা চলে।

খাড়ব রাগেও আরোহণে এবং অবরোহণে বিভিন্নতা হয়। যেমন বসন্ত রাগ খাড়ব। প ব্যবহৃত হয় না। আবার আরোহণে রে৷ স্বুরটিকে বাদ দিয়া যায়। কাজেই আরোহণে ঔড়ব ও অবরোহণে খাড়ব। এইজন্য ইহাকে খাড়বই বলে। ঔড়ব রাগের আরোহণেও ঔড়ব, অবরোহণেও ঔড়বই হইয়া থাকে, খাড়ব রাগ—খাড়ব-ঔড়ব, খাড়ব-খাড়ব ও ঔড়ব-খাড়ব এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। সম্পূর্ণ রাগও এইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যেমন ঃ—

আরোহণ	অবরোহণ	
ঔড়ব	ঔড়ব	ঔড়ব
খাড়ব	খাড়ব	খাড়ব
ঔড়ব	খাড়ব	
খাড়ব	ঔড়ব	
সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
সম্পূর্ণ	ঔড়ব	
সম্পূর্ণ	খাড়ব	
ঔড়ব	সম্পূর্ণ	
খাড়ব	সম্পূর্ণ	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাট নিরূপণ

মূর্চ্ছনা বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, এক-একটা শুদ্ধস্বর হইতে তাহার অষ্টম স্বর পর্য্যন্ত ক্রমে আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করাই মূর্চ্ছনা। যথা :—

স—র—গ+ম—প—ধ—ন—স̇...

র—গ+ম—প—ধ—ন+স̇—র̇...

গ+ম—প—ধ—ন+স̇—র̇—গ̇... ইত্যাদি*

প্রত্যেকটি মূর্চ্ছনারই স্বর-অন্তর পৃথক পৃথক হইতেছে। স মূর্চ্ছনায় তৃতীয় ও চতুর্থ এবং সপ্তম ও অষ্টম স্বর অর্দ্ধান্তর। আবার র মূর্চ্ছনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর অর্দ্ধান্তর। এইরূপ প্রত্যেকটি মূর্চ্ছনাতেই স্বর-অন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন দেখা যাক্, কোন্ মূর্চ্ছনায় কি কি পরিবর্ত্তন হয়।

স মূর্চ্ছনা :—স—র—গ+ম—প—ধ—ন+স̇
(তৃতীয় ও চতুর্থ এবং সপ্তম ও অষ্টম অর্দ্ধান্তর)

র মূর্চ্ছনা :—র—গ+ম—প—ধ—ন+স̇—র̇
(দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অর্দ্ধান্তর)

গ মূর্চ্ছনা :—গ+ম—প—ধ—ন+স—র—গ
(প্রথম ও দ্বিতীয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অর্দ্ধান্তর)

---

* এখানে আর মূর্চ্ছনাগুলির অবরোহণ দেওয়া হইল না। আর স্বর-অন্তরগুলি পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর নহে জানিয়াও বুঝিবার পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া স্বর-অন্তরগুলিতে পূর্ণান্তরের ও অর্দ্ধান্তরের চিহ্নই ব্যবহার করা হইয়াছে।

ম মূর্চ্ছনা ঃ—ম—প—ধ—ন+স̊—র̊—গ̊+ম̊

(চতুর্থ ও পঞ্চম এবং সপ্তম ও অষ্টম অৰ্দ্ধান্তর)

প মূর্চ্ছনা ঃ—প—ধ—ন+স̊—র̊—গ̊+ম̊—প̊

(তৃতীয় ও চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অৰ্দ্ধান্তর)

ধ মূর্চ্ছনা ঃ—ধ—ন+স̊—র̊—গ̊+ম̊—প̊—ধ̊

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অৰ্দ্ধান্তর)

ন মূর্চ্ছনা ঃ—ন+স̊—র̊—গ̊+ম̊—প̊—ধ̊—ন̊

(প্রথম ও দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অৰ্দ্ধান্তর)

র মূর্চ্ছনার র সুরকে যদি স ধরা যায় এবং ঐ মূর্চ্ছনার ন্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অৰ্দ্ধান্তর করিয়া গ্রাম করি তবে আমরা কোমল গ (গো) ও কোমল ন (নো) দুইটি বিকৃত সুর স্বরগ্রামে পাই। কারণ র হইবে স, গ হইবে র, ম হইবে কোমল গ, কেন না, গ হইতে ম অৰ্দ্ধান্তর। কাজেই র হইতে অৰ্দ্ধান্তরবিশিষ্ট সুর পাইতে হইবে। কোমল গ, র সুরের অৰ্দ্ধান্তর। তারপর প হইবে ম ; কারণ কোমল গ হইতে ম পূর্ণান্তর। ধ হইবে প, ন হইবে ধ, স̊ হইবে কোমল ন ; ন হইতে স̊ অৰ্দ্ধান্তর। এইজন্য ধ হইবে অৰ্দ্ধান্তর সুর কোমল ন। তারপর র̊ হইবে স̊। সুতরাং র মূর্চ্ছনা ঃ—

র—গ+ম—প—ধ—ন+স̊—র̊

স—র+গো—ম—প—ধ+নো—স̊

এইরূপ প্রত্যেকটি মূর্চ্ছনার প্রথম সুরটিকে স ধরিলে নানা বিকৃত সুর পাওয়া যায়।

রাগরাগিণী কি তাহা বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, রাগরাগিণী এক-একটা বিশেষ বিশেষ স্বরবিন্যাস মাত্র। শুদ্ধ ও বিকৃত সুরগুলি দিয়া এক একটা বিভিন্ন প্রকার স্বরবিন্যাস করা হইয়াছে ও সেই বিভিন্ন স্বরবিন্যাসগুলি চিনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন, সুরের শুদ্ধমধ্যম স্থানে কড়িমধ্যম ব্যবহার করিয়া, অর্থাৎ—স–র—গ—মী+প–ধ—ন এই শুদ্ধ ছয়টি ও কড়িমধ্যম, মোট সাতটি সুর বিশেষ বিশেষ ভাবে ওলটপালট করিয়া তিনটি স্বরবিন্যাস করা যায়। তাহাদের নাম—ইমন, কল্যাণ ও শঙ্করা।

কোন্ কোন্ সুরগুলি উপরোক্ত রাগিণীগুলিতে ব্যবহৃত হয় তাহা যদি লিখিয়া দেখাইতে হয় তবে আমরা এইরূপ ভাবে লিখিব। যথা ঃ—

স—র–গ—মী+প–ধ—ন+স

রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত সুরগুলি এইরূপভাবে পর পর সজ্জিত করিয়া লেখা হইলে তাহাকে আধুনিক হিন্দুসঙ্গীতে ঠাট বলে।

উপরে যে ঠাটটি লেখা হইয়াছে, তাহা ইমনের ঠাট। এই ঠাটে যে-সুরগুলি আমরা দেখিতেছি তাহাকে ইমনের কঙ্কাল বলা যায়। এই কঙ্কালগুলি একটি একটি বিশেষ নিয়মে সজ্জিত করিয়া তাহাকে গীত-অলঙ্কার রূপ মাংসচর্ম্ম পড়াইলেই, অর্থাৎ আশ, গিট্‌কারী, মীড় প্রভৃতি ব্যবহার করিলেই, ইমন রাগিণীর মূর্ত্তি বা রূপ হইয়া পড়ে। কাজেই ভাবের কথায় রাগরাগিণীর কঙ্কালগুলির সমষ্টিকে ঠাট বলা যায়। বস্তুতঃ, রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত সুরগুলির পর পর সজ্জিত সমষ্টিকে ঠাট বলা হয়।

র মূর্চ্ছনার ঠাটে আমরা কোমল গ ও কোমল ন পাইয়াছি। ইহা সিন্ধুর ঠাট। এই ঠাটে যে যে সুর থাকে তাহাদের ওলটপালট স্বরবিন্যাসে সিন্ধু রাগিণীর রূপ হয়। আবার এই ঠাটে সাহানা, বাগেশ্রী ইত্যাদি রাগিণীর রূপ হয়। একজন যদি জিজ্ঞাসা করে যে, বাগেশ্রী রাগিণীতে কি

কি সুর ব্যবহৃত হয়? তখন এই বলিলেই হইবে যে, তাহা সিন্ধুর ঠাটে গাওয়া হয়।

পূর্ব্বে বর্ণিত মূর্চ্ছনাগুলিকে ঠাটে পরিণত করিলে ঐ ঠাটগুলিতে কি কি রাগরাগিণী প্রস্তুত হয় দেখাইতেছি।

ঠাটে রাগরাগিণী

স—র—গ+ম—প—ধ—ন+সঁ স-মূর্চ্ছনার ঠাট বা স্বাভাবিক ঠাট। এই ঠাটে আলাহিয়া, বেলাবল, কুকুভ, দেবগিরি, ছায়া, ছায়ানট, নট-নারায়ণ, লুম, শঙ্করাভরণ, ও মল্লার গাওয়া হয়।

র—গ+ম—প—ধ—ন+সঁ—রঁ র-মূর্চ্ছনা
স—র+গো—ম—প—ধ+নো—সঁ সিন্ধুর ঠাট

সিন্ধু, সাহানা, বাগেশ্রী, মুখারী, এই ঠাটের অন্তর্গত।

গ+ম প—ধ—ন+সঁ—রঁ—গঁ গ-মূর্চ্ছনা
স+রো—গো—ম—প+ধো—নো—সঁ ভৈরবী ঠাট

ভৈরবী ও আশাবরী এই ঠাটের অন্তর্গত।

ম—প—ধ—ন+সঁ—রঁ—গঁ+মঁ ম-মূর্চ্ছনা
স—র—গ—মী+প—ধ—ন+সঁ ইমনের ঠাট

ইমন, কল্যাণ ও শঙ্করা, এই ঠাটে গাওয়া হয়।

প—ধ—ন+সঁ—রঁ—গঁ+মঁ—পঁ প-মূর্চ্ছনা
স—র—গ+ম—প—ধ+নো—সঁ কামোদ ঠাট

শুক্লবেলাবল, সরফর্দ্দা, কামোদ, নট-মল্লার, নিশাসাগ, সুরট, দেশ, গারা, তিলককামোদ, পাহাড়ী, খাম্বাজ ও ঝিঁঝিট এই ঠাটের অন্তর্গত। তবে এই সব রাগে শুদ্ধ ন-ও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

ধ – ন + স – র – গ + ম – প – ধ ধ-মূর্চ্ছানা
স + র + গো – ম – প + ধো – নো – র্স কানড়ার ঠাট

দরবারী কানড়া, গান্ধারী, জৌনপুরী, সুখরাই তোড়ী, মুদ্রাতোড়ী, দেশীতোড়ী এই ঠাটের অন্তর্গত।

ন + স – র – গ + ম – প – ধ – ন ন-মূর্চ্ছনা
স + রো – গো – ম + মী – ধো – নো – র্স অপ্রচলিত ঠাট

এই ঠাটে কোন রাগরাগিণী গাওয়া হয় না, এই জন্য অপ্রচলিত ঠাট লেখা হইল।

এই যে ঠাট দেখান হইল তাহাকে আবার ঔড়ব ও খাড়ব করিয়া আমরা অনেক ঠাট পাইতে পারি। তাহাদিগকে মূর্চ্ছনার ঔড়ব ঠাট ও মূর্চ্ছনার খাড়ব ঠাট বলা হয়। যে-কোন একটি স্বর বাদ দিয়া (স স্বর ছাড়া) আমরা প্রত্যেক মূর্চ্ছনা হইতে ছয়টি করিয়া ঠাট পাইতে পারি। সুতরাং সাতটি মূর্চ্ছনায় বিয়াল্লিশটি খাড়ব ঠাট হইতে পারে, তবে এত সব ঠাট সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না। কয়েকটি বাছা বাছা ঠাট ব্যবহৃত হয় মাত্র। মূর্চ্ছনার ঔড়ব ও খাড়ব ঠাট

নীচে মূর্চ্ছনার ঔড়ব ঠাট ও মূর্চ্ছনার খাড়ব ঠাট দেখাইতেছি।

স মূর্চ্ছনার ঔড়ব ঠাট

স – র – ০ + ম – প – ০ – ন + র্স

এই ঠাটে বৃন্দাবনী সারঙ্গ গাওয়া হয়।

স মূর্চ্ছনার খাড়ব ঠাট

স – র – গ + ০ – প – ধ – ন + র্স

বিভাস ও দেশকার এই ঠাটের অন্তর্গত।

মূর্চ্ছনার ঔড়ব ঠাট বা খাড়ব ঠাট লইয়া ঠাট-প্রকরণ শেষ নহে। আরও এক প্রকার ঠাট আছে। তাহাকে মূর্চ্ছনার বিকৃত ঠাট বলে। মূর্চ্ছনার বিকৃত ঠাট

মূর্চ্ছনার কোন কোন বিকৃত সুরকে বাদ দিয়া সেই সুরের স্থানে অন্য একটি সুরকে বসাইলে যে ঠাট হইবে তাহাকে মূর্চ্ছনার বিকৃত ঠাট বলা হয়। যথা :—

গ মূর্চ্ছনার বিকৃত ঠাট

গ+ম+০—ধো+ধ—ন+স—র+গো—গ

স+রো+০—গ+ম—প+ধো—নো+ন—স

ভৈরব রামকেলী ও গুর্জ্জরী এই ঠাটের অন্তর্গত। গ মূর্চ্ছনায় আমরা পাই :—

গ+ম—প—ধ—ন+স—র—গ

কিন্তু এখানে প-এর স্থানে ধো ব্যবহার করিয়াছি। আবার গো সুরটিকে জোর করিয়া এখানে বসাইয়া দিয়েছি। এইরূপ ঠাটই মূর্চ্ছনার বিকৃত ঠাট।

বিকৃত ঠাটেরও আবার মূর্চ্ছনার বিকৃত ঔড়ব ঠাট বা মূর্চ্ছনার বিকৃত খাড়ব ঠাট হইতে পারে। এককথায়, এইভাবে সহস্র সহস্র ঠাট প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতে মাত্র কয়েকটি ঠাটই ব্যবহৃত হয়।

ঠাটের অন্তর্গত রাগরাগিণী

এখানে প্রচলিত রাগরাগিণীর ঠাট ও জাতির একটা তালিকা দিতেছি। তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

ঠাটের অন্তর্গত রাগরাগিণী*

ঠাট	জাতি	বর্জ্জিত	রাগরাগিণী
সাতটি শুদ্ধ স্বর	সম্পূর্ণ	—	আলাহিয়া, বেলাবল, কুকুভ দেবগিরি. ছায়া, ছায়ানট নট-নারায়ণ. লুম. শঙ্করাভরণ, মল্লার ও হেমন্ত
ঐ	খাড়ব	ম	বিভাস ও দেশকার
ঐ	ঔড়ব	গ, ধ	বৃন্দাবনী সারঙ্গ
ঐ	ঐ	গ, ন	সামন্ত সারঙ্গ. দুর্গা
ঐ	ঐ	ম, ন	ভূপালী
কোমল ন	সম্পূর্ণ	—	ঝিঁঝিট
দুই ন	ঐ	—	শুক্ল-বেলাবল, সরফর্দ্দা, কামোদ, নট-মল্লার, নিশাসাগ, সুরট, দেশ, গারা, পাহাড়ী, তিলক কামোদ, খাম্বাজ
ঐ	খাড়ব	গ	সুর মল্লার
ঐ	ঐ	র	বিহগড়া
ঐ	ঔড়ব	গ, ধ	মধুমাত সারঙ্গ
কড়ি ম	সম্পূর্ণ	—	ইমন, কল্যাণ
ঐ	ঔড়ব	র, প	হিন্দোল
কড়ি ম	ঔড়ব	র, ধ	বেহাগ, মালশ্রী
দুই ম	সম্পূর্ণ	—	বেলাবল, গৌড়-সারঙ্গ, ইমনকল্যাণ, হাম্বীর, কেদারা, গ্রাম, ইমনভূপালী, শঙ্করা,

* কয়েকটি রাগরাগিণীর ঠাট-নরূপণে সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ রাগরাগিণী সম্বন্ধে সকলেই প্রায় একমত।

ঠাট	জাতি	বর্জ্জিত	রাগরাগিণী
দুই ম	ঔড়ব	গ, ন	দুর্গেশ্বরী
কোমল,গ ও ন	সম্পূর্ণ	—	সিন্ধু, সাহানা, বাগেশ্রী, মুখারী
ঐ	খাড়ব	প	সরস্বতী
ঐ	ঔড়ব	র, প	চন্দ্রকোশ
কোমল ন	ঔড়ব	র, প	শুভারতী
কোমল গ ও	সম্পূর্ণ	—	ভীমপলশ্রী, রাজ-বিজয়
দুই ন			সিন্ধুড়া, দেওশাখ, বাহার মিয়ামল্লার, আড়ানা
কোমল গ,	ঐ		জৌনপুরী, গান্ধারী
ধ, ন			দরবারী কানড়া, সুখরাই তোড়ী মুদ্রাতোড়ী, দেশীতোড়ী
ঐ	খাড়ব	ম	সুহাতোড়ী
ঐ	ঔড়ব	র, প	মালকোশ
কোমল গ, ধ, দুই ন	সম্পূর্ণ		নায়কী
ঐ	খাড়ব	র	নচারীতোড়ী
কোমল র, গ, ধ, ন	সম্পূর্ণ		ভৈরবী, আশাবরী

ঠাট	জাতি	বর্জ্জিত	রাগরাগিণী
কোমল র, গ, ধ, দুই ন	সম্পূর্ণ		গুর্জ্জরী
ঐ	খাড়ব	ম	লক্ষ্মীতোড়ী
কোমল র, গ, ধ, দুই ন কড়ি ম	সম্পূর্ণ		দরবারী তোড়ী
ঐ	খাড়ব	প	বাহাদুরী তোড়ী
কোমল র, ধ দুই গ ও দুই ন	সম্পূর্ণ		খট, পিলু বারোঁয়া
কোমল র	ঐ		মঙ্গল
ঐ	খাড়ব	প	দীপক, ললিত
কোমল র, ধ, দুই ন	সম্পূর্ণ		ভৈরব, রামকেলী
কোমল র, ধ	ঐ		যোগিয়া, ভাটিয়ারী, কালাংড়া
কোমল র কড়ি ম	ঐ		মালবী, মালিগৌরা

ঠাট	জাতি	বর্জ্জিত	রাগরাগিণী
কোমল র কড়ি ম	খাড়ব	প	পুরিয়া, মারওয়া, জয়ন্ত, সোহিনী
ঐ	ঐ	ধ	কুমারী
কোমল র দুই ম	ঐ	প	বসন্ত
ঐ	সম্পূর্ণ		পূরবী
কোমল র, ধ	ঐ		ধানশ্রী, জৈশ্রী, পুরিয়া, ধানশ্রী, ত্রিবেণী, বৈরাটি, শ্রীরাগ, পরজ
কোমল র, ধ, দুই ম	ঐ		গৌরী, গুণকেলী
কোমল গ, ধ কড়ি ম	সম্পূর্ণ		মুলতানী
কোমল গ, ধ	ঐ		পিলু
কোমল ধ কড়ি ম	খাড়ব	র	সাজগিরি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদী, সংবাদী, অনুবাদী, বিবাদী

পূর্ব্বে ঔড়ব ও খাড়ব-শ্রেণী দেখাইতে গিয়া বলিয়াছি যে, কোন কোন রাগে দুইটি এবং কোন কোন রাগে একটি সুর ব্যবহার করা হয় না। এইরূপ সুরই রাগের বর্জ্জিত সুর। বর্জ্জিত সুর রাগরাগিণীতে ব্যবহার করিলে রাগের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। যেমন ভূপালী রাগিণীতে ম ও ন সুর লাগে না। কিন্তু যদি ভূপালীতে এই দুইটি সুর ব্যবহার করা হয় তবে ভূপালীর রূপ থাকিবে না। এই বর্জ্জিত সুরকেই আধুনিক সঙ্গীতে বিবাদী সুর বলা হয়। বিবাদী সুর

রাগরাগিণীতে যে সব সুর ব্যবহৃত হয় সেই সুরগুলির মধ্যে যে সুরটির বিশেষ সাহায্য না লইলে রাগের ঠিক রূপ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না, সেই সুরটিকে বাদী সুর বলে। হিন্দুস্থানী কথায় ইহাকে জান্ বলা হয়। জান্ অর্থ প্রাণ। যে সুরটি রাগের প্রাণস্বরূপ তাহাই বাদী। যেমন—মালকৌশ রাগে ম সুর বাদী! এই ম সুরটি প্রধান ও প্রাণস্বরূপ। ম সুরের বিশেষ সাহায্য না লইয়া মালকৌশ-এর রূপ প্রকাশ করা অসম্ভব। বাদী সুর

রাগে ব্যবহৃত সুরগুলির মধ্যে বাদী সুর ব্যতীত যে সুরটি অন্যান্য সুরের মধ্যে অধিক বার ব্যবহৃত হয় তাহাকে সংবাদী সুর বলে। আর বাদী ও সংবাদী সুর ছাড়া রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য সুরগুলিকে অনুবাদী সুর বলা হয়। সাধারণতঃ, রাগরাগিণীতে বাদী সুর রাজার ন্যায়, সংবাদী সুর মন্ত্রীর ন্যায়, অনুবাদী সুর ভৃত্যের ন্যায় এবং বিবাদী সুর শত্রুর ন্যায় বুঝায়। সংবাদী সুর অনুবাদী সুর

কোন্ রাগে কোন্‌টি বাদী সুর সেই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে সাধারণতঃ কতকগুলি রাগ আছে যাহাদের বাদীসুর সম্বন্ধে সকলেই একমত। যেমন—

দেশ	র	বাদী
সিন্ধু	র	”
ভূপালী	গ	”
ইমন্ কল্যা।	গ	”
কেদারা	ম	”
মালকৌশ	ম	”
কুমারী	প	”
যোগিয়া	প	”
হাম্বীর	ধ	”
বিভাস	ধ	”
শঙ্করা	ন	”

এইরূপ আরও অনেকগুলি রাগরাগিণী আছে যাহাদের বাদী সম্বন্ধেও অনেকেই প্রায় একমত।

সাতটি সুর যে ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে তাহাতে বেশ একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। স—র—গ+ম সুরগুলি ১. ১. $\frac{১}{২}$. অন্তরবিশিষ্ট কিম্বা শ্রুতিহিসাবে ৪.৩.২ অন্তরবিশিষ্ট। সেইরূপ প—ধ—ন+স সুরগুলিও ১. ১. $\frac{১}{২}$ অন্তরবিশিষ্ট কিম্বা শ্রুতিহিসাবে ৪.৩.২ অন্তরবিশিষ্ট।

স র—গ+ম

প—ধ+ন—র্স

এখানে স সুরের সঙ্গে প সুরের, র-এর সঙ্গে ধ-এর, গ-এর সঙ্গে ন-এর ও ম-এর সঙ্গে স-এর মিল দেখা যায়। প-কে স ধরিলে ধ হইবে র; ন হইবে গ; ও স হইবে ম। অতএব স=প; র=ধ; গ=ন; ম=স.

মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সর্ব্বদা মিল চায়। রাগরাগিণী সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। রাগরাগিণী সুরের মিলনস্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হয়। এইরূপ মিলনই রাগরাগিণীর প্রাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাগে যে স্বরটি অধিকবার ব্যবহৃত হয় তাহা বাদী স্বর। সংবাদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, বাদী স্বরটি ছাড়া অন্যান্য স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটি বেশী ব্যবহৃত হয় তাহাই সংবাদী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, বাদী স্বরের সঙ্গে যে স্বরের মিল আছে সেই স্বরটি সংবাদী হয়। যেমন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, স = প বা র = ধ ; এখানে স বাদী হইলে প সংবাদী বা র বাদী হইলে ধ সংবাদী ; এইরূপ প বাদী হইলে স সংবাদী বা ধ বাদী হইলে র সংবাদী হইবে।

শ্রুতি হিসাবে সংবাদী বাহির করিবার নিয়ম

শ্রুতিবিভাগ মতে সংবাদী বাহির করিবার রীতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত। যে স্বরটি বাদী হইবে তাহার নয় শ্রুতির পরে দশ শ্রুতিতে বা তের শ্রুতির পর চৌদ্দ শ্রুতিতে যে স্বর থাকিবে তাহাই সংবাদী হইবে। কিন্তু যদি এই নয় শ্রুতির মধ্যে কোন বর্জ্জিত স্বর পড়ে, নয় বা তের শ্রুতি গণনা করিয়া যে স্বর পাওয়া যাইবে সেই স্বরের পরবর্ত্তী স্বরটি সংবাদী হইবে।

নীচে বাদী, সংবাদী, অনুবাদীর তালিকা দিতেছি।

বাদী	সংবাদী	অনুবাদী
স	ম ও প	রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বরগুলি অনুবাদী
র	ধ	
গ	ন	
ম	স	
প	স	
ধ	র	
ন	গ	

বিকৃত স্বর বাদী হইলে বিকৃত স্বরই সংবাদী হইবে। যে স্বরের বিকৃত স্বর বাদী, সেই স্বরের সংবাদী যে স্বর তাহার বিকৃত স্বর সংবাদী হইবে। যেমন—

বাদী	সংবাদী	অনুবাদী
রো	মী, ধো	রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য সুর অনুবাদী
গো	নো	
মী	রো	
ধো	রো	
নো	গো	

শুদ্ধ, শালঙ্ক, সঙ্কীর্ণ

যে রাগে অন্য কোন রাগের মিশ্রণ নাই তাহা শুদ্ধ; যে রাগ যে-কোন দুইটি রাগের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন তাহা শালঙ্ক এবং যে রাগ তিন বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলা হয়।

কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি শালঙ্ক বা কোন্‌টি সঙ্কীর্ণ এই সব সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখা যায়। রাগরাগিণীর শুদ্ধ শালঙ্ক বা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিভাগ সঠিক ভাবে গঠন করিতে আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন বা আধুনিক কোন সঙ্গীতজ্ঞই সক্ষম হন নাই। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে প্রায় সব রাগরাগিণীতেই অন্যান্য রাগরাগিণীর ছায়া অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এখন যেমন আমাদের দেশে দুই বা তিন রাগিণী মিশ্রিত করিয়া গীত বা বাদন করিলে মিশ্র আখ্যা দেওয়া হয়, পূর্ব্বকালে এইরূপ রাগের মিশ্রণজনিত রাগিণীকে এক-একটা নাম দেওয়া হইত এবং সেই সব রাগরাগিণীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ শ্রেণীবিভাগের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় হিন্দুসঙ্গীতে এই তিনটি সংজ্ঞা আছে বলিয়াই এখানে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইল।

সমপ্রাকৃতিক রাগরাগিণী

অনেক রাগরাগিণী আছে যাহাদের একটির সঙ্গে আর একটির বেশ সাদৃশ্য আছে, শুনিলেই মনে হয় দুইটিই প্রায় এক রাগ। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমরা বিদেশে পরিচিত লোকের মত লোক দেখিয়া থাকি; নিকটে গিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই আবার বুঝা যায় যে, লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। আকারে একরূপ হইলেও প্রকারে তাহার অনেক

প্রভেদ থাকে। এইরূপ রাগকে, অর্থাৎ যে-যে রাগরাগিণীর সঙ্গে যে-যে রাগ-রাগিণীর সৌসাদৃশ্য আছে তাহাদিগকে সম-প্রাকৃতিক রাগরাগিণী বলা হয়।

নীচে সমপ্রাকৃতিক রাগরাগিণীর একটা তালিকা দিতেছি।*

ভৈরব ও রামকেলী	সমপ্রাকৃতিক
বাঙ্গালী ও ভাটিয়ারী	,,
বিভাস ও দেশকার	,,
ভীমপলশ্রী ও রাজবিজয়	,,
শ্রী, গৌরী ও বৈরাটী	,,
মারোয়া, পুরিয়া ও জয়ন্ত	,,
ইমন ও কল্যাণ	,,
ইমনকল্যাণ, কেদারা, হাম্বীর ও শ্যাম	,,
খাম্বাজ ও ঝিঁঝিট	,,
সিন্ধু, কাফি ও সিন্ধুড়া	,,
বাগেশী পটমঞ্জরী ও আভিরী	,,
পঞ্চম ও ললিত	,,

গ্রহ ও ন্যাসস্বর

যে সুর হইতে প্রথম রাগরাগিণী আরম্ভ হয় তাহাকে গ্রহস্বর বলে। আর যে সুরে রাগরাগিণী সমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যাসস্বর বলা হয়। অধিকাংশ রাগরাগিণীর গ্রহ ও ন্যাস স্বরের কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রায়ই ষড়জ হইতে উত্থাপিত হইয়া ঐ সুরেই সমাপ্ত হয়। দুই-একটি রাগরাগিণীর পৃথক পৃথক গ্রহ ও ন্যাসস্বর পাওয়া যায় মাত্র।

রাগ চিনিবার উপায়

এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূত্র বলা হইল, এই সকল কথা একটু অনুধাবন করিলেই রাগ চিনিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ, রাগ চিনিতে হইলে দেখিতে

* এই তালিকাটি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায়-দস্তিদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

হইবে, যে-গীত বা গৎ হইতেছে তাহা কোন্ জাতীয়, অর্থাৎ তাহা ঔড়ব, খাড়ব, না সম্পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, তাহার ঠাট কি ? কোন্ কোন্ কড়ি-কোমল ও স্বাভাবিক সুর ব্যবহৃত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, সেই গীত বা গতের আরোহণ বা অবরোহণে কোন সুর বর্জ্জিত হইতেছে কি-না। সমপ্রাকৃতিক রাগরাগিণী চিনিতে হইলে ঔড়ব-সম্পুর্ণ, খাড়ব-ঔড়ব ইত্যাদি আরোহণ-অবরোহণের পর্য্যায়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চতুর্থতঃ, কোন কোন সুর মীড়সংযোগে উচ্চারিত হইতেছে কি-না। পঞ্চমতঃ, কোন সুর হইতে অন্য কোন বিশেষ সুরে লাফাইয়া যাইতেছে কি-না ও তাহার গ্রহ ও ন্যাসস্বর কি। রাগরাগিণী চিনিতে এই পাঁচটি বিষয় বিশেষ আবশ্যক।

রাগরাগিণী সহজে সকলে চিনিতে পারে না। রাগের রূপ কণ্ঠে বা বাদ্যে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তাহা চেনা সহজ হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্কণের চিত্র বা রাগরাগিণীর চিত্র দুইটিই প্রায় এক প্রকার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি পুস্তকে ও পত্রিকায় দেখিতে দেখিতে আমাদের এমন হইয়াছে যে, আমরা তাহা দেখিলেই চিনিয়া লইতে পারি বা কবির প্রতিকৃতি অঙ্কনে যদি কোন শিল্পীর কোন কিছু ভুল থাকে তাহাও আমরা ধরিয়া দিতে পারি, সেইরূপ যে যে-রাগের সঙ্গে পরিচিত তাহা শুনিলেই চিনিয়া লইতে পারে বা নামধাম বলিয়া দিতে পারে। খুব ভাল ভাবে জানা থাকিলে কোন্ কোন্ স্থানে কি ভুল হইতেছে বা কোথায় কোন্ রাগ মিশ্রিত আছে তাহাও বলিয়া দিতে পারা যায়।

রাগরাগিণী এক-একটি মূর্ত্তি। চিত্রের মূর্ত্তি দেখিয়া যেমন চিত্রটি চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ গীতের বাদ্যের মূর্ত্তি শুনিয়া চিনিতে হয়। চিত্রাঙ্কণের চক্ষু বা সঙ্গীতের কান যেমন তেমন চক্ষু বা কান হইলে চলে না, তাহা বিশেষ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রচলিত তালের ঠেকা

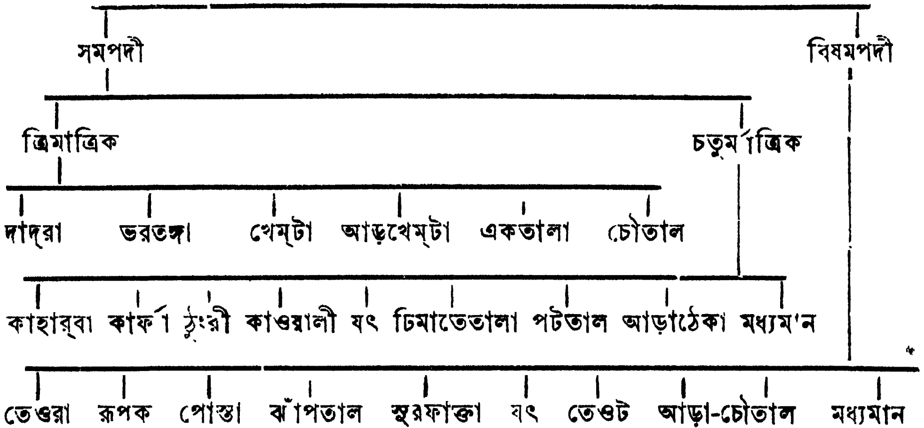
তালপ্রকরণে তাল সম্বন্ধে কতক বলা হইয়াছে। তালে আর একটি কথা আছে তাহা লয়। গীতবাদ্যে স্বরের কালসমতা রাখার নাম লয়, অর্থাৎ ছন্দের লঘু-গুরু ঝোঁকগুলি দেখাইয়া মাত্রার ওজন সূক্ষ্মভাবে সমান রাখার নামই লয়। তালের লয়টুকুই আসল জিনিষ। সঙ্গত কি তাহা বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তালযন্ত্র গীতের সঙ্গে সঙ্গে চলে বলিয়া সঙ্গত নাম হইয়াছে। সঙ্গতের প্রকৃত সংজ্ঞা (definition) এই যে, গীতের লয়ের সঙ্গে বাদ্যের লয়ের ঐক্য করার নাম সঙ্গত। লয় কি; ঠা, দুন, চৌদুন

মাত্রাপ্রকরণে মাত্রার গতি বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে যে,মাত্রার গতি তিন প্রকার। বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত। লয়ও এইরূপ তিন প্রকারের হয়। দ্রুত লয়ের দ্বিগুণ সময়ে মধ্যলয় হয় এবং মধ্যলয়ের দ্বিগুণ সময়ে বিলম্বিত হয়। যেমন এক সেকেণ্ডকে এক মাত্রা ধরিলে যদি দ্রুত লয় হয় তবে দুই সেকেণ্ডকে এক মাত্রা ধরিলে বিলম্বিত লয় হইবে। চলিত কথায় বিলম্বিত লয়কে ঠা, মধ্যলয়কে দুন ও দ্রুতলয়কে চৌদুন বলে।

তালযন্ত্র বাদনে ঠেকা, গদ্, মহড়া ও তেহাই এই চারিটি সংজ্ঞা আছে। ঠেকা কি তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, গানের ছন্দের অনুরূপ বোলকে ঠেকা বলে। বাদন অধিকতর মিষ্টি করিবার জন্য এক বা ততোধিক বোল এক সঙ্গে অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে বাজান হয়; তাহাকে গদ্ বলে। আর ঠেকা বাজাইতে বাজাইতে গদ্ ধরিলে শ্রুতিকটু হয় বলিয়া ঠেকার পর ও গদের পূর্ব্বে কয়েকটি ছোট ছোট বোল বাজান হয় তাহার নাম মহড়া।

আস্থায়ীর শমে গান শেষ করিবার নিয়ম। গায়কের সঙ্গে সঙ্গে যদি সাদাসিধা ভাবে বাদনে বিরাম দেয় তবে শ্রুতিমধুর হয় না বলিয়া গান শমে সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে অনুরূপ বোল বাজান হয়, তাহাকে তেহাই বলে। তেহাই সমাপ্তির চিহ্ন। তেহাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে শমে গীত বা বাদ্যের ঐক্য হইলেই গীত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (good finish) হইয়া থাকে।

প্রচলিত তালসমূহ



নীচে তালসমূহের ঠেকার বোল দেওয়া যাইতেছে। বোলগুলি মাত্রা অনুযায়ী পড়িয়াও ছন্দের লঘু-গুরু ঝোকগুলি সঠিকভাবে দিয়া মুখস্থ করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে গীত শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।*

* ওস্তাদ প্রসন্ন বণিক মহাশয়ের নিকট অধিকাংশ বোল পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রণীত 'তবলা তরঙ্গিণী' ও 'মৃদঙ্গ প্রবেশিকা' হইতে অনুমতি অনুসারে কতক বোল এখানে উদ্ধৃত হইল।

ত্রিমাত্রিক ছন্দের তাল

দাদ্‌রা

\+ ০

| ধিন ধিন তাগ | ধা দিন তাগ ||

ভরতঙ্গা

\+ ১

| ধিগ. না | ধা তি না

খেম্‌টা

\+ ৩ ০ ১

| ধা কে টে | না কে টে | তে টে ধি | না কে টে ||

আড়খেম্‌টা

\+ ১ +

| কেটে ধিন্ | ধাগি নাগি ধিন্ | ধা কেটে ধিন্ |

৩ ০

ধাগি নাগি ধিন্ | তা ||

একতালা

\+ ২

| ধিন্ ধিন্ ধা ধা | তিন্ তা তা তিন্ |

৩

ধাগি তেরেকেটে ধিন ধা ||

(প্রকারান্তরে)

\+ ১ +

| ধিন্ ধিন্ না | ধা থুন্ না | কত্তে ধাগে |

৩

তেরেকেটে ধিন ধা ||

চৌতাল

\+ ০ ২ ০

| ধা ধা | দিন্ তা | কৎ তাগে | দিন্ তা |

৩

তেটে কতা | গদি ঘেনে ||

চতুর্মাত্রিক ছন্দের তাল

কাহারবা

\+ ০

| ধা গি তে নে | না গি ধে নে ||

কার্ফা

\+ ০

| ধিগ নাতে কিটি তাক্ | তিগ্ নাতে কিটি তাক্ ||

ঠুংরী

\+ ২

| ধা ধিন ধা দিন | তা ধিন ধা ধিন ||

কাওয়ালী

\+ ৩ ০

| ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা দিন দিন তা |

১

তা ধিন ধিন তা ॥

যৎ (সম্পদী)

\+ ৩ ০ ১

| ধা ধিন | ধাগে ধিন | তা দিন্ | ধাগে ধিন্ ॥

ঢিমা তেতালা

(পাখোয়াজের ঠেকা)

\+ ৩ ০

| ধা গে দিন তা | তেটে দিৎ তা ধা | দিন তা ক তা |

১

তেটে কতা গেদি ঘেনে ॥

বাঁয়তেবলার ঠেকা

\+ ৩ ০

| ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | ধা দিন দিন তা |

ধা ধিন ধিন ধা ॥

পটতাল

\+ ০

| ধা গে ধা গে | দিন তা ক তা ॥

আড়াঠেকা

০   ১   +

। । । । । । । । । ।

| তা ধিন | — তা ধিন — | ধিন — তা ধিন |

৩   ০

। । । । । ।

— — ধিন্ তা | তিন্ — ||

মধ্যমান্

০   ১

। । । । । । । । । । । । ।

| ধা ধিন্ — ধা ধিন্ — | ধা - ধা ধিন — ধা ধিন্ — |

+   ৩

। । । । । । । । । । । । ।

| ধা — ধা ধিন্ — ধা ধিন — | ধা — না ধিন্ —

০

। । । । ।

ধা তিন্ — | তা — ||

বিষমপদী তাল

তেওরা

+   ২   ৩

। । । । । । ।

| ধা দিন্ তা | তেটে কতা | গেদি ঘেনে ||

রূপক

০   ১   ২

। । । । । । ।

| তা দেন্ তা | ধুমা কেটে | গেদি ঘেনে ||

ঝাঁপতাল (পাখোয়াজের ঠেকা)

+   ৩   ০   ১

। । । । । । । । । ।

| ধা গে | ধা গে দিন | তা গে | ধা গে দিন ||

বায়া-তবলার ঠেকা

+ ৩ ০ ১

| ধিন না | ধিন ধিন না | তেৎ না | ধিন্ ধিন্ না ‖

সুরফাক্তা

+ ৩ ২ ৩ ০

| ধা ঘেনে | নাগ ধি | ঘেনে না | গ দ্দী | ঘেনে নাগ ‖

যৎ (বিষমপদী)

+ ৩ ০ ১

| ধা ধিন | ধা গে দিন্ | তা দিন | ধাগে দিন্ ‖

তেওট

+ ৩ ০

| ধিন ধা ধা | ধা ধিন ধা ধা | দিন তা তা |

১

| ধিন ধিন ধা ধা ‖

ধামার

+ ০ ২ ০ ৩ ০

| ক ধে টে | ধে টে | ধা — | গ দি নে | দি নে | তা — ‖

আড়া-চৌতাল (পাখোয়াজের ঠেকা)

+ ২ ৩

| ধা গে | ধা গে দিন তা | কৎ তা দিন্ তা |

৪

| তেটে কতা গেদি ঘেনে ‖

বাঁয়া-তবলার ঠেকা

+			২				৩			
।	ধিন	কেটে	। ধিন	না	ধিন	না	। তেৎ	তা	ধিন্	ধিন্

৪				
।	না	ধিন্	ধিন্	না ॥

তাল-গ্রহ

তালের গ্রহ তিন প্রকার। যথা—সম্, অতীত, অনাগত। এখানে তালের গ্রহ অর্থে তালের গ্রহণ বা ধর্তা। গ্রহণ হইতে গ্রহ হইয়াছে।

গীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে ঠেকা ধরাকে, অর্থাৎ গীত আরম্ভ হইবার ঠিক মুহূর্ত্তেই ঠেকা ধরাকে সমগ্রহ কহে। গীত আরম্ভের পূর্ব্বে ঠেকা ধরিয়া পরে গান ধরিলে অতীত-গ্রহ হয়। আর গীতারম্ভের পূর্ব্বে গান ধরিয়া পরে ঠেকা ধরিলে অনাগত গ্রহ হয়। সাধারণতঃ সম-গ্রহেই গীত হইয়া থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অতীত ও অনাগত গ্রহ ধরিয়া গান করা কঠিন। তবে ইহা জানিয়া রাখিয়া লয় জ্ঞান জন্মিলে পর গান করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বর-উৎপত্তি

কথা ও শব্দ-বিন্যাস

আমরা যে সকল কথা বলি তাহা কি? মনের ভাব অন্যকে বুঝাইবার জন্য আমরা কতকগুলি শব্দ বা ধ্বনিকে নানা ভাবে বিন্যাস করিয়া যখন মুখে বলি তখনই তাহাকে আমরা কথা নাম দিয়া থাকি। অতএব শব্দ-বিন্যাসই কথা। বাঙ্গালী একপ্রকার শব্দবিন্যাস করিয়া কথা বলে, উড়িষ্যা-বাসী অন্য আর একপ্রকার শব্দ-বিন্যাস করিয়া কথা বলে, বা ইংরেজ আর এক বিশেষ প্রকার শব্দবিন্যাস করিয়া কথা বলে। যাহারা যে শব্দ-

বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারে, অন্যেরা পারে না। ক বলিতে ক ও অ এই দুইটি ধ্বনির সমষ্টিকে বুঝায়। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনি হইতেই বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমে মানুষ কথা কহিতে শিখিয়াছে এবং তাহার অনেক পরে কথাগুলি অক্ষরে লিখিতে সক্ষম হইয়াছে। পাহাড়িয়া জাতি লিখিতে বা পড়িতে জানে না, কিন্তু কথা কহিয়া মনের ভাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সাম্‌না-সাম্‌নি না থাকিলে একজন আর একজনকে কথা বলিতে পারে না। দূরদেশে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলেই শব্দ হইতে উৎপন্ন বর্ণগুলি লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। বর্ণগুলি বুঝাইবার জন্য আমরা কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার করি, তাহাকে অক্ষর বলা হয়। যাহা হউক, এই সমস্ত হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনি হইতেই কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

ধ্বনি হইতে সুরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সুরগুলিও এক একটি শব্দ। একটা খাদ শব্দ, একটা বা চড়া শব্দ, স সুর একটা শব্দ। ধ সুরও একটা চড়া শব্দ। পৃথিবীতে অসংখ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে সাতটি সুর বাহির হইয়াছে এবং এই সাতটি সুর হইতেই সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুর ও কথা ধ্বনি হইতেই উৎপন্ন হয়। এখন ধ্বনি কিরূপে হয় তাহাই দেখা যাক্। ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রথম সঙ্গীতশিক্ষার্থীর জানিয়া রাখা উচিত।

ধ্বনির উৎপত্তি ও কম্পন

কোন কিছুতে আঘাত করিলে তাহার অণুপরমাণুতে এক প্রকার কম্পন উৎপন্ন হয়। তাহা বায়ুর সাহায্যে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে ও আমরা শুনিয়া থাকি। একটা পাতলা বাটিতে আঘাত করিলে শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু হাত দিয়া বাটিটা স্পর্শ করিলেই শব্দ তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বাটিতে আঘাত করিবা-মাত্র বাটির অণুপরমাণুতে যে কম্পন উৎপন্ন হয় তাহা হাতের স্পর্শে থামিয়া যায়, কাজেই শব্দও থামিয়া যায়। বাটিতে আঘাত করিয়া ধীরে ধীরে উহার গায়ে হাত দিলে অনেক সময় উহার কম্পন অনুভব করা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কম্পন হইতেই ধ্বনির উৎপত্তি। সেতার, এস্রাজ

ইত্যাদি তারযন্ত্রের তারে আঘাত করিবামাত্র তাহাতে কম্পনের সৃষ্টি হয় ও সেই কম্পন শব্দ উৎপন্ন করে। যন্ত্রের তারের উপরে এক টুক্‌রা কাগজ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বা একটা সুতার ঢিলা আংটি তারটিতে পরাইয়া সেই তারে আঘাত করিলে কাগজের টুক্‌রা বা সুতার আংটী কাঁপিয়া উঠিতে দেখা যায়। ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, আঘাতপ্রাপ্ত পদার্থের কম্পন হইতেই ধ্বনির উৎপত্তি: কম্পনের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইবে ততই চড়া বা উচ্চ শব্দ হইবে। আর কম্পনের সংখ্যা যতই কম হইবে ততই খাদ শব্দ হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এক সেকেণ্ডে ষোল-সতেরটি কম্পনের কম কম্পন হইলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই না; আর ১৮,০০০ হাজার কম্পনের বেশী কম্পন হইলেও আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। এখানে ভ্রমর ও প্রজাপতির দৃষ্টান্ত দেওয়া থাকে: ভ্রমর যখন উড়িতে থাকে তখন শব্দ হয়, কিন্তু প্রজাপতি যখন উড়িতে যায় তখন একটুও শব্দ হয় না। তার কারণ আর কিছুই নহে, প্রজাপতির শরীর খুব হাল্‌কা ও পাখা বড়, কাজেই উড়িবার জন্য বা উপরে স্থির থাকিবার জন্য ইহাকে পাখা খুব বেশী কাঁপাইতে হয় না। সেকেণ্ডে ষোলটি কম্পনও ইহার পাখা হইতে হয় না। কাজেই আমরা শব্দও শুনিতে পাই না, কিন্তু ভ্রমরের শরীর ভারী, তার উপর পাখা ছোট, কাজেই উড়িবার জন্য বা উপরে স্থির থাকিবার জন্য খুব দ্রুত পাখা নাড়িতে হয়; কম্পনও বেশী হয় তাই শব্দও হয়। আবার ভ্রমর উপরে উঠিবার সময় চড়া শব্দ হয় ও নীচে নামিবার সময় নীচু খাদ শব্দ হয়। তার কারণ উপরে উঠিবার সময় আরও দ্রুত পাখা নাড়িতে হয়, কম্পনও বেশী হয়, কাজেই শব্দও চড়া হয়। নীচে নামিবার সময় উহাকে পাখা কম নাড়িতে হয়, কম্পনও কম হয়, কাজেই শব্দও খাদ নীচু হয়।

ধ্বনির বিভিন্নতা

তিনটি কারণে ধ্বনির বিভিন্নতা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, কম্পন যতই বাড়িবে শব্দ ততই চড়া হইবে ও কম্পন যত কম হইবে শব্দ ততই খাদ হইবে। কাজেই কম্পন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ধ্বনি বিভিন্ন ঘটিবে। একটা বাটিতে আস্তে আঘাত করিলেই একপ্রকার ধ্বনি হয়, আবার জোরে আঘাত

করিলেই অন্যরূপ ধ্বনি হয়। তাহার কারণ জোরে আঘাত করিলে কম্পন-সংখ্যা বাড়িয়া থাকে, কাজেই ধ্বনিও জোর চড়া হয়। আর আস্তে আঘাত করিলে কম্পন-সংখ্যা কম এবং ধ্বনিও মৃদু খাদ হয়। পদার্থভেদেও ধ্বনির বিভিন্নতা হয়। যেমন—কাঁসার বাটীতে আঘাত করিলেই একপ্রকার শব্দ হইবে আবার কাঁচের বাটীতে আঘাত করিলেই অন্যরূপ শব্দ উৎপন্ন হইবে। আবার যে-পদার্থে আঘাত করা হয় তাহার আকৃতির বিভিন্নতায় ধ্বনিরও বিভিন্নতা ঘটে। যেমন—পাতলা বাটীতে আঘাত করিলে যেরূপ ধ্বনি হয়, পুরু বাটীর ধ্বনি সেরূপ হয় না। কাজেই কম্পনভেদে, পদার্থভেদে ও পদার্থের গুণভেদে ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

বায়ুকম্পন

মাছ জলে থাকে এবং জল ছাড়া হইলে যেমন এক মুহূর্ত্তও তাহাদের চলে না, তেমনই আমরাও বাতাসের মধ্যে থাকি এবং আমাদেরও বাতাস ছাড়া এক মুহূর্ত্তও চলে না। আমাদের চতুর্দ্দিকে বাতাস, এই বায়ুমণ্ডলই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। জলে একটা ঢিল ছুঁড়িলে যেমন গোলাকৃতি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ও সেই তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ বায়ুতেও গোলাকৃতি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ও সেইরূপ ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ধ্বনি হইলেই বায়ুতে কম্পন হয়। যে-কোন তারযন্ত্রের দুইটি তার এক সুরে বাঁধিয়া এই দুইটি তারের যে-কোন একটি তারে আঘাত করিলে দেখা যায় যে, পাশের এক সুরে বাঁধা তারটি কাঁপিতেছে। তাহার কারণ এই যে, যে-তারটিতে আঘাত করা হয় প্রথমে সেই তারটি কাঁপিয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে এবং এই বায়ুকম্পন পাশের তারটিকে গিয়া আঘাত করে তাহাতে তারটিতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারটি যদি একসুরে বাঁধা না থাকে তবে কাঁপিবে না। যে-তারটিতে আঘাত করা হইবে, তাহা সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিবে যদি পাশের তারটিও ততবার কাঁপিতে সমর্থ হয় তবেই কাঁপিবে, নতুবা নহে। যে-তারটিকে আঘাত করা হয় সেকেণ্ডে ইহার যত কম্পন হয় বাতাসেও ঠিক ততবার কম্পন হয় এবং ইহা যতবার কম্পিত হয়, কোন তার বা জিনিষকে ততবার কাঁপাইয়া তুলে।

ধ্বনি হইবামাত্র বায়ুতে কম্পন হয়। কাজেই আমরা যখন কথা বলি বা গান করি তাহাতেও বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই বায়ুকম্পন আমাদের কানে প্রবেশ করে ও আমরা তাহা শুনিতে পাই। বায়ুকম্পন এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেণ্ডে সমগ্র পৃথিবী শতবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। বায়ুকম্পন কানে প্রবেশ করিলে আমরা শুনিতে পাই এবং সেই বায়ুকম্পন পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে বটে, কিন্তু আমি এখানে যে কথা বলি তাহা দিল্লীর লোকে শুনিতে পায় না কেন? আমরা সা বলিতেই গোলাকৃতি যে-ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় সেই ঢেউ একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তমধ্যস্থানের সমস্ত লোকের কানে গিয়া তাহাদিগকে তাহা শুনাইয়া দেয়। কম্পনভেদে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। যতই কম্পনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সেই ঢেউয়ের বৃত্তও তত বড় হয় এবং আরও অনেক বেশী লোককে তাহা শুনাইতে সমর্থ হয়। ধ্বনির কম্পনভেদে এই যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী তাহাও আবার বায়ুর উত্তাপের কম-বেশীতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

কম্পনের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী

একই সুর সেতার বেহালাতে বা হারমোনিয়মে বাজিতে থাকিলেও প্রত্যেকটিতে একটা বিভিন্নতা থাকে। সেতারের তার যতবার কাঁপিতেছে বেহালার তারও ততবার কাঁপিতেছে বা হারমোনিয়মের রীডও ঠিক ততবারই কাঁপিতেছে অথচ সেতারের ধ্বনি একপ্রকারের; বেহালার ধ্বনি অন্য প্রকারের; আবার হারমোনিয়মের ধ্বনি এক বিশেষ প্রকারের। এইরূপ হইবার কারণ, সেতারে সা ধ্বনিত হইবার সময় কেবল এক সা সুরই ধ্বনিত হয় না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চ সপ্তকের আরও কয়েকটি সুর ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়। বেহালায় সা ধ্বনিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেও উচ্চ সপ্তকের কয়েকটি সুর ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়, কিন্তু সেতারের সা ধ্বনির সঙ্গে যে-সব সুর ধ্বনিত হয় তাহাতে সেই সব সুর ধ্বনিত হয় না, অন্য সুর ধ্বনিত হয়। সেইরূপ হারমোনিয়মের সা সুরের সঙ্গেও উচ্চ সপ্তকের কয়েকটি বিভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়। এরূপ মানুষের কণ্ঠ হইতে যে সা সুর বাহির হয় তাহাতে উচ্চ সপ্তকের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সুর ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়। এই উচ্চ

সপ্তকের সুরগুলি ধ্বনিত হওয়াতেই কণ্ঠের গাম্ভীর্য্যের মিষ্টত্ব বা কর্কশত্ব প্রকাশ পায়। উচ্চ সপ্তকের কোন কোন সুর ধ্বনিত হইলে কর্কশত্ব প্রকাশ পায় বা কোন কোন সুর ধ্বনিত কণ্ঠে মিষ্টত্ব বা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়। এই সব উচ্চ সপ্তকের সুরগুলি ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয় বলিয়াই কম্পনের সংখ্যা এক হইলেও কম্পনের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী দৃষ্ট হয়। সেতারের ধ্বনি হইতে বাতাসে যেরূপ ঢেউ উৎপন্ন হয় বেহালার ধ্বনি হইতে সেরূপ হয় না বা মানুষের কণ্ঠধ্বনি হইতে যে-ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাহাও পৃথক হয়। এই সব বিশেষ ভঙ্গীযুক্ত ঢেউ আমরা যন্ত্রসাহায্যে দেখিতে পারি, তাহা আঁকিয়া লইতেও পারি। সেতারের একটা গৎ বাজিতে থাকিলে বায়ুমণ্ডলে যে-ঢেউরাশির সৃষ্টি হয় তাহা যন্ত্রসাহায্যে কোন কিছুতে খোদিয়াও লইতে পারা যায়। ইহাই গ্রামোফোন রেকর্ডের (Gramophone Records) সৃষ্টিকথা।

গ্রামো-ফোনের মূল সূত্র

ঢাকের এক দিকের চাম্‌ড়ায় আঘাত করিলেই অন্য দিকের চামড়া কাঁপিয়া উঠে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, বায়ু কম্পিত হইয়া অন্য দিকের চামড়াকে আঘাত করে ও তাহা কম্পিত হয়। এই কারণেই কাগজ, অভ্র, চামড়া ইত্যাদি পাতলা দ্রব্য মুখের সম্মুখে রাখিয়া কথা বলিলে সেইগুলিও কম্পিত হয়। যদি একটা মোটা নলের এক দিক অভ্র দিয়া আবৃত করিয়া—অনাবৃত মুখের সম্মুখে বসিয়া কথা বলি, গান করি বা কোনরূপ ধ্বনি উৎপন্ন করি, তবে সেই অভ্রটি কাঁপিয়া উঠিবে। ধ্বনি হইতে বায়ুমণ্ডলে ঢেউয়ের সৃষ্টি করিবে সেই ঢেউ অভ্রটিকে আঘাত করিবে ও ইহাতে তাহা কম্পিত হইবে। সেই অভ্রটির সঙ্গে যদি সুকৌশলে একটা সূচ সংযুক্ত করিয়া লওয়া যায় তবে সেই সূচটিও অভ্রকম্পনের সহিত কম্পিত হইতে থাকিবে। একজন সেতারবাদক যদি সেই নলটির অনাবৃত মুখের সম্মুখে বসিয়া সেতারের একটা গৎ বাজাইতে থাকে তবে সেই সেতারের ধ্বনি হইতে যে ভঙ্গীযুক্ত বায়ুকম্পন হইবে, সূচটিতেও সেই ভঙ্গীযুক্ত কম্পন হইবে। এদিকে একটা থালার এক পিঠে মোম গলাইয়া বেশ পুরু করিয়া লাগাইয়া

এবং থালার মোম-দেওয়া পিঠ সেই স্থচটির সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখিয়া থালাটিকে যদি ঘুরাইতে থাকি তবে স্থচটির কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোমের উপরে আঁচড় পড়িতে থাকিবে। সেতারের ধ্বনি আসিয়া স্থচটিকে কখনও কম কম্পিত করিবে, কখনও বেশী, কখনও বা আস্তে কখনও বা জোরে কম্পিত করিতে থাকিবে ও সঙ্গে সঙ্গে যে তরঙ্গায়িত আঁচড় পড়িতে থাকিবে তাহাও কখনও গভীর হইয়া পড়িবে, কখনও বা খুব কম আঁচড় পড়িবে। সেতারের গৎ যে ভঙ্গীযুক্ত তরঙ্গের স্থষ্টি করিবে তাহাই এই আঁচড়ের মধ্যে খোদিত বা অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এই আঁচড়যুক্ত থালাটিই সেতারের গতের রেকর্ড হইবে। গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি অবশ্য মোমের তৈয়ারী নয়। ধাতব দ্রব্য দ্বারা তৈয়ার করা হয়। রেকর্ডগুলিতে যে বৃত্তাকার রেখা আছে যাহার উপর গ্রামোফোনের sound box-এর পিনটি ঘুরিতে থাকে সেই রেখার মধ্যেই নানাবিধ ঢেউ খোদিত করা থাকে।)

এখন রেকর্ড হইতে কিরূপে আমরা পুনরায় গানটি শুনিতে পাইব তাহাই দেখা যাক। যে আঁচড়গুলি গৎটি বাজাইবার সময় পড়িবে সেই আঁচড়গুলির উপর দিয়া যদি একটি অভ্র-সংযুক্ত স্থচ চালাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই খোদিত অসমান ঢেউগুলির উপর দিয়া চলিতে গেলে স্থচটিও অসমানভাবেই কম্পিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থচ-সংযুক্ত অভ্রটিও অসমান ভাবেই কাঁপিতে থাকিবে। গৎটি বাজাইবার সময় সেই নলের মুখের অভ্রটি যে ভাবে কম্পিত হইয়াছিল এই স্থচসংযুক্ত অভ্রটিকেও সেইরূপ ভাবে কম্পিত করিবে এবং এই কম্পিত ধ্বনির স্থষ্টি করিবে। গৎটি বাজাইবার সময় যেরূপ ধ্বনি হইয়াছিল অবিকল সেইরূপ ধ্বনি উৎপন্ন করিবে এবং তাহা আমরা শুনিতে পাইব। গ্রামোফোনের sound box-এ একটা পাতলা অভ্রবৎ জিনিষ থাকে। তাহার সহিত একটা স্থচ (পিন) সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। সেই পিন রেকর্ডের উপর ঘর্ষিত হইলেই রেকর্ডে খোদিত ঢেউ অনুযায়ী শব্দ হয় ও আমরা অবাক হইয়া শুনিতে থাকি।

আমরা শুনি এবং কান দ্বারা শুনি। যদি এই প্রশ্ন হয়, 'কানদ্বারা কি

করিয়া শুনি ?' তবে আমরা একেবারে উত্তর দিই 'কানই আমাদের শ্রবণ-যন্ত্র।' কিন্তু কানের ভিতর কি কি জিনিষ আছে জানিয়া রাখিলেই উত্তর দেওয়া সহজ হইয়া পড়ে। কানের ভিতরে প্রথমে একটা পাতলা চামড়ার আবরণ আছে। তাহাকে চর্ম্মপটহ বলা হয়। তাহার পরে তিনটি হাড়ের টুক্‌রা পাওয়া যায় এবং তাহারও পরে শামুকের মত একটা যন্ত্র পাওয়া যায়; তাহাকে শম্বুক-যন্ত্র বলে। এস্রাজের এক পাশের তরফের তারগুলি যেমন খাদ সুর হইতে ক্রমে উচ্চ সুরে বাঁধা থাকে এই শম্বুক-যন্ত্রের মধ্যেও অতিখাদ সুর হইতে অতিউচ্চ সুরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রী খাদ হইতে ক্রমে চড়া সুরে পর পর বাঁধা আছে। এই সব তার লোহার বা পিতলের তার নয়। তাহা প্রাকৃতিক তার এবং প্রকৃতি হইতেই মিল অনুসারে বাঁধা। সঙ্গীতে তিন সপ্তক সুরের দরকার হয়। কিন্তু শম্বুক যন্ত্রটিতে চার-পাঁচ শত সপ্তকের অধিক সপ্তকের সুর বাঁধা আছে।

কানের আভ্যন্তরিক কথা

একটা ধ্বনি হইবামাত্র বায়ুমণ্ডলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাহা আসিয়া প্রথম চর্ম্মপটহকে কম্পিত করে ও সেই কম্পন হাড়ের টুক্‌রা বাহিয়া শম্বুক-যন্ত্রে যায়। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক সুরে বাঁধা তারের একটাকে কাঁপাইয়া তুলিলেই অন্যান্য তারগুলি কাঁপিয়া উঠে। চর্ম্মপটহের কম্পন শম্বুক-যন্ত্রে গিয়া তথাকার প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা তন্ত্রীকে কাঁপাইয়া তুলে। সবগুলি তন্ত্রীই কাঁপিয়া উঠে না। বাহিরের ধ্বনির কম্পনসংখ্যা যত, কম্পনযুক্ত তারকে ততবারই কাঁপাইয়া তুলে, তাহাতেই আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়।

কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি

নাক দিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাস একটা নালী দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা গলা হইতে ফুস্‌ফুসে গিয়াছে, তাহাকে শ্বাসনালী বলে। আরও একটি নালী গলা হইতে পেটে গিয়াছে। আমরা যাহা-কিছু আহার করি তাহা তাহার ভিতর দিয়া পেটে যায়। শ্বাসনালী দিয়াই আমাদের কণ্ঠধ্বনি উৎপন্ন হয়।

শ্বাসনালীর মুখ গোল। ইহার মুখে দুইটি পাতলা চামড়া লাগান থাকে। তাহাদিগকে Vocal chords, অর্থাৎ 'বাক্‌তন্তু' বলা হয়। এই

দুইটি বাক্‌তন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি পড়িয়া থাকে। মন কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলেই দুইটি বাক্‌তন্তু উঠিয়া দাঁড়ায়। তখন ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাতাস আসিয়া ইহাদিগকে কম্পিত করে। এই কম্পন হইতে স্বর উৎপত্তি হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ফুস্‌ফুসের সহায়তায় বাক্‌তন্তুর কম্পনই কণ্ঠস্বর উৎপত্তির কারণ।

কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন মত

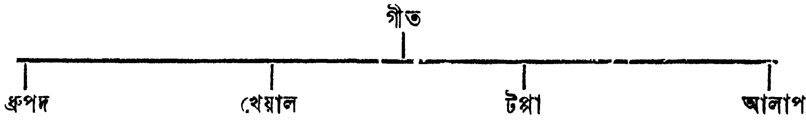
প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ কণ্ঠস্বর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে মন দেহাগ্নিকে আঘাত করে। শরীরে ব্রহ্মগ্রন্থি নামে যে গ্রন্থি আছে এবং তাহাতে যে বায়ু থাকে, দেহাগ্নি গিয়া সেই বায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে চালনা করে। সেই বায়ু ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে আসিয়া যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও বদনে ধ্বনি উৎপন্ন করে।

ইউরোপীয় শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, বাক্‌তন্তুর কম্পনে মস্তক ও বক্ষ কম্পিত হয় এবং ধ্বনি উৎপাদনে সহায়তা করে। কারণ খাদ সুর গাহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে বক্ষকম্পন বেশ ভাল করিয়াই টের পাওয়া যায়। কিন্তু নাভির সঙ্গে স্বরের উৎপত্তির কোন সম্বন্ধ আছে কি-না তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই বলেন না। যাহা হউক, বাক্‌তন্তুর কম্পন হইতেই কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয় এবং ফুস্‌ফুস্‌ ও বাক্‌তন্তু এই দুইটিই যে কণ্ঠস্বরোৎপাদনের মূল উপাদান এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গীত-প্রণালী

গীত গাহিবার প্রণালী চারি প্রকার, অর্থাৎ চারি প্রকার রীতিতে গান করা হয়। তাহাদের নাম ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও আলাপ। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিতেছি।

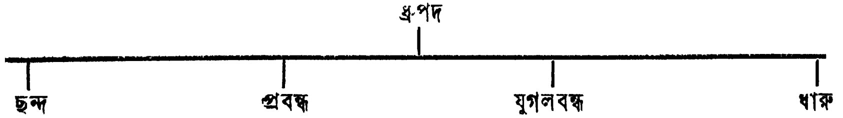


ধ্রুপদ অতি প্রাচীন। মুনিঋষিগণ ধ্রুপদ গান গাহিতেন। কারণ ধ্রুপদ গান করা এক প্রকার সাধনা। এই গান সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া উত্তম হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গানের সময় যে শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া যায়, তাহাতে গায়কের অজ্ঞাতসারে এমন ন্যাসক্রিয়া হয় যে, গায়ক চির-স্বাস্থ্যবান হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে। ধ্রুপদ

দেবতাগণের লীলা ও তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন, রাজামহারাজগণের যশ-বর্ণনা ও তাঁহাদের যুদ্ধ-বর্ণনাই ধ্রুপদ গানে থাকে। গদ্যে পদ্যে দুই প্রকার ছন্দেই তাহা লিখিত। গানের স্বর-বিন্যাসে এক এক সুরে স্থায়িত্ব অনেক ও গীত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনা। ইহাতে গমক, মীড় ও প্রস্বনের কাজই বেশী হইয়া থাকে। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার লয়েই গীত হয়। ধ্রুপদে বাঁট করিবার রীতি প্রচলিত। এই প্রকার গানের ধীর গতি বলিয়া তাহা উপাসনার বিশেষ উপযোগী। ধ্রুপদে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি তুকে গান হয়। কোন কোন ধ্রুপদ গানে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই কলিই দেখা যায়। সমস্ত রাগ-রাগিণীতেই ধ্রুপদ গীত হয়।

চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওরা, ঢিমেতেতালা, পটতাল এই সকল তালেই ধ্রুপদ গান হইয়া থাকে।

ধ্রুপদ নানা প্রকার। যথা ঃ—ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ ও ধারু।



যে-ধ্রুপদ গানের মধ্যে ছন্দ এই কথাটির উল্লেখ আছে তাহাকে ছন্দ বলা হয়।

যে সকল গানে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি তুকে ভিন্ন ভিন্ন তাল ব্যবহৃত হয় তাহাকে প্রবন্ধ বলে। যে সকল ধ্রুপদ গান দুইজনে এক সঙ্গে গাহিতে হয়; একজন গান গাহিয়া যায় আর একজন সেই গানের কথা না বলিয়া সুর তাল লয় ঠিক রাখিয়া সারগম্ বলিয়া যায় তাহাই যুগলবন্ধ। আর যে ধ্রুপদে ধারু এই শব্দটির উল্লেখ আছে তাহাকেই ধারু বলা হয়।

ধ্রুপদ গাহিবার রীতিও আবার চারি ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম নওড়হার বাণী, ডাগর বাণী, খাণ্ডার বাণী ও গওড়হার বাণী। গওড়হার বাণী আজকাল প্রচলিত। খাণ্ডার বাণী ধ্রুপদও প্রচলিত আছে, অন্য দুই প্রকার বাণী বর্ত্তমানে অপ্রচলিত।

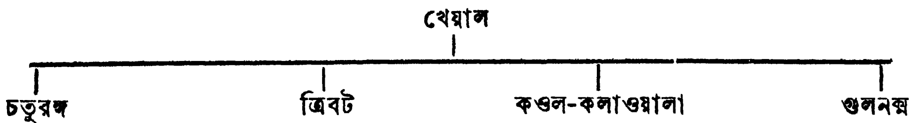
খেয়াল

খেয়ালের সুর ধ্রুপদ হইতে সংক্ষিপ্ত, ধ্রুপদের স্থায়িত্ব অনেক, কিন্তু খেয়ালে গানের সুরে স্থায়িত্ব কম। কাজেই ধ্রুপদের গতি এক প্রকার আর খেয়ালের গতি অন্য প্রকার।

খেয়ালের রচনাও সংক্ষেপ। প্রায় সব খেয়াল গানেই আস্থায়ী ও অন্তরা পর্য্যন্ত রচিত হয়। ক্বচিৎ দুই একটা গানে সঞ্চারী আভোগও আছে। খেয়ালের প্রধান অঙ্গ তান্। তান্ অর্থে বিস্তার করা, গানকে স-গমক গিট্‌কারী, কম্পন, আশ, মীড়, ইত্যাদির সাহায্যে সুরের বিস্তার করাই খেয়াল

গানের বৈশিষ্ট্য। খেয়ালে সুরের কাজ খুব বেশী করিতে হয়। দ্রুত শ্রুতি-মধুর তান করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। এইজন্য ধ্রুপদ হইতে খেয়াল কঠিন।

তেতালা, আড়াঠেকা, তেওট, একতালা মধ্যমান ইত্যাদি তালে খেয়াল গীত হয়। কিন্তু খেয়াল গানে সুরের কাজ অত্যন্ত বেশী করিতে হয় বলিয়া তালের খুব বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, কোনমতে সম মিলাইতে পারিলেই হয়। কারণ তানকর্ত্তব করিতে করিতে তালের দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া যায় না। আর তালের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে সুরের কাজ তত হয় না বলিয়া খেয়ালে তালের প্রাধান্য নাই। খেয়ালে ধ্রুপদের মত সমস্ত রাগরাগিণীই গাওয়া হয়। খেয়াল চারি ভাগে বিভক্ত। যথা :—চতুরঙ্গ, ত্রিবট, কওল-কলাওয়ালা ও গুলনক্স।



চতুরঙ্গ গানের একটি কলিতে গানের কথা, অন্যটিতে নাদের, তুমদের, দানি, তানা ইত্যাদি অবোধ্য শব্দ, অপরটিতে তেরেকেটে তাক্ ধা কেটেতাক ইত্যাদি তাল বাদ্যের বোল এবং আর অন্যটিতে সারগম্ থাকে। চতুরঙ্গ শব্দটি গানের কথার মধ্যে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বাণীর চারিটি কলিবিশিষ্ট গানকেই চতুরঙ্গ বলা হয়।

ত্রিবট গানের তিনটি কলি থাকে। একটিতে গানের কথা; অন্যটিতে নাদের দের দানি ইত্যাদি শব্দ ও অপরটিতে ধা কেটেতেটে তাক ধিন্‌তা ইত্যাদি বাদ্যের বোল থাকে, ইহাকে ত্রিবট বলে। গানের কথায় ত্রিবট শব্দটির উল্লেখ থাকিবে। বিভিন্ন তিন প্রকার বাণীযুক্ত গানকে ত্রিবট বলে।

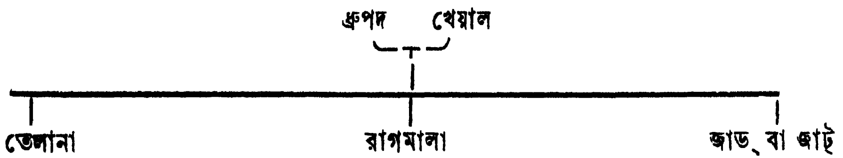
আরবী ভাষায় রচিত মহম্মদের লীলাকীর্ত্তন গানকে কওল-কলাওয়ালা বলা হয়। যে-গানে গুল শব্দের উল্লেখ আছে তাহাকে গুলনক্স বলা হয়। গান পারস্য ভাষায় রচিত।

আর কয়েকপ্রকার গান আছে তাহা ধ্রুপদ খেয়াল উভয়েরই অন্তর্গত। যথা—তেলেনা, রাগমালা, ও জাড্ বা জাট্।

দারা, দীম, তুম নাদের ইত্যাদি অবোধ্য শব্দ যোগে যে গান হয় তাহা তেলানা। ইহার অপর নাম তিরানা।

একটি গানের মধ্যে অনেকগুলি রাগরাগিণীর সমাবেশ থাকিলে তাহাকে রাগমালা বলে। ইহার অপর নাম সুরসাগর।

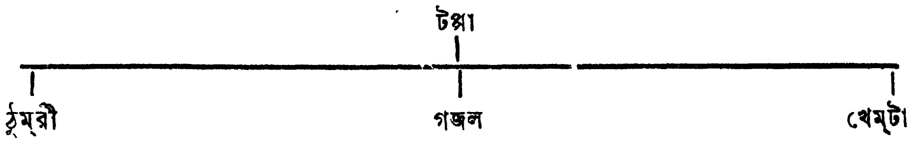
গানের এক-একটি পদ এক এক ভাষায় রচিত ও গানে অনেক রাগ-রাগিণীর স্বর-বিন্যাস থাকিলে জাড্ বা জাট্ বলা হয়।



টপ্পা

টপ্পাতে খেয়ালের মতই তান্ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার পৃথক ঢং। গিট্কারী খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। টপ্পা গান করিতে কণ্ঠসাধনার বিশেষ প্রয়োজন। এত সুন্দর তান ব্যবহার করিতে হয় যে, মনে হয় উচ্চাঙ্গের টপ্পা খেয়ালের চাইতেও কঠিন। খেয়ালের মত ইহাতে সমস্ত রাগরাগিণী গাওয়া হয় না। টপ্পায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রাগরাগিণী গাওয়া হইতে পারে না। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু, কাফি, ভৈরবী, পিলু, বারঁওয়া, সুরট, দেশ ইত্যাদি ও কয়েকটি মিশ্রিত হালকা রাগিণীতে টপ্পা গাওয়া হয়।

টপ্পার রচনা খেয়ালের মতই সংক্ষিপ্ত। আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই কলিতেই গীত হয়। টপ্পা গীত প্রায় সবই প্রেমসঙ্গীত। কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত ও উচ্চভাবাপন্ন গান দেখা যায়। সচরাচর খেয়ালের তালেই টপ্পা গীত হয়। তবে মধ্যমান তালে টপ্পা-গীতই প্রকৃত টপ্পা। অনেকে বলে খেয়ালের তাল আড়াঠেকা আর টপ্পার তাল মধ্যমান। টপ্পাও তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা ঃ—ঠুম্‌রী, গজল, খেম্‌টা।



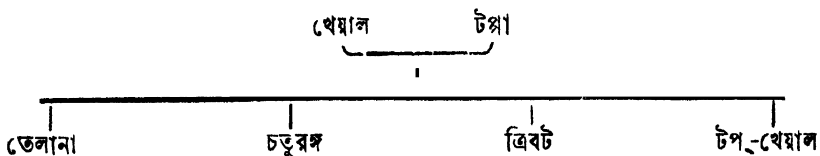
ঠুম্‌রী গান খুব আধুনিক, ইহাতে টপ্পায় ব্যবহৃত রাগরাগিণীই ব্যবহৃত হয়। দাদরা, আদ্ধা, তেতালা, কাহারবা, কার্ফা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালে গাওয়া হয়। গীতকে অধিকতর শ্রুতিমধুর করিবার জন্য গানের নির্দ্ধারিত রাগরাগিণী ব্যতীত অন্যান্য রাগরাগিণীও তাহাতে অতি সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়। রাগমালাতে অনেক রাগরাগিণীর সমাবেশ থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটি রাগের বৈশিষ্ট্য, ঠাট, বাদী-সংবাদী আরোহণ-অবরোহণ দ্বারা রক্ষিত হয়।

ঠুংরীতে এ সমস্ত কিছুই ঠিক থাকে না। ইহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। নানা প্রকার সুর-কৌশলের দ্বারা গানে বৈচিত্র্য আনয়ন করাই ইহার কাজ। এই জন্যই ধ্রুপদ খেয়াল হইতে টপ্পা ঠুম্‌রী কঠিন মনে হয়। কারণ ঠুম্‌রীর নিত্য নূতন তান্ দ্বারা সুরে বহুরূপ বৈচিত্র্য আনিতে হইলে কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

পারস্য ভাষায় রচিত প্রেমসঙ্গীতকে গজল বলা হয়। ইহা সচরাচর পোস্তা তালে গীত হয়।

খেম্‌টা, আড়াখেম্‌টা, কাহারবা ইত্যাদি তালের গানই খেম্‌টাশ্রেণীভুক্ত। খেম্‌টা গানে তালের উপর বেশী যতটুকু ঝোঁক দেওয়া হয়, সুরের উপর ততটুকু ঝোঁক দেওয়া হয় না।

তেলানা, চতুরঙ্গ, ত্রিবট টপ্পাতেও গাওয়া হয়। টপ্-খেয়াল নামে আর এক শ্রেণীর গীত আছে, তাহা টপ্পা ও খেয়ালের অপূর্ব্ব মিশ্রণে উৎপন্ন। খেয়ালের রাগ ও টপ্পার রাগ মিশ্রিত করিয়া গীত হইয়া থাকে। যেমন :— ভৈরবী বাহার।



ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার গীত দেখা যায়। যেমন—হোরী বা হোলী, বাউল ও কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসবের গানকে হোরী বা হোলী বলা হয়। ধ্রুপদে এবং টপ্পায়ই এই শ্রেণীর গীত আছে। ধ্রুপদে ধামার তালে ও টপ্পায় সচরাচর যৎ তালে গীত হয়।

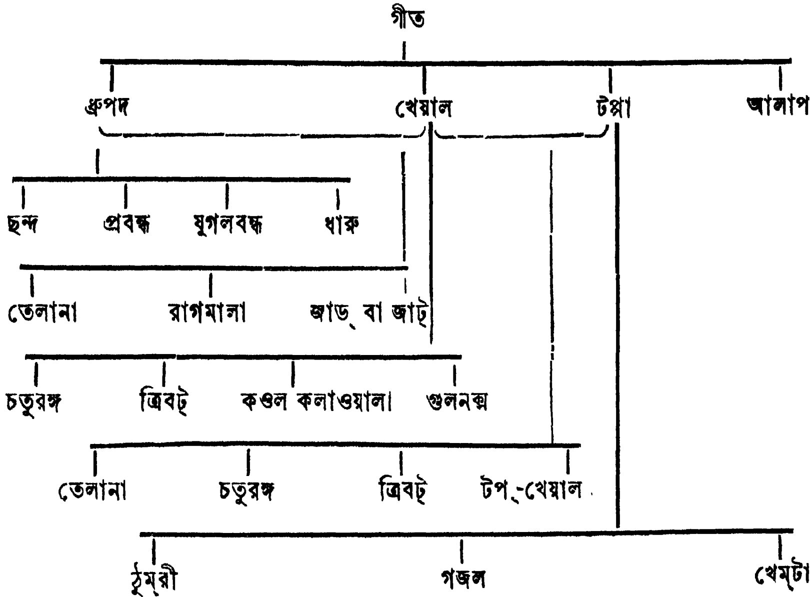
বাউল ও কীর্ত্তন বাংলার নিজস্ব গীত। অন্যান্য দেশে এই দুই শ্রেণীর গীত দেখা যায় না। এইজন্য ইহাদিগকে ভারতীয় সঙ্গীতে ধরা হয় না। ইহাদের সুর সরল ও ভাবপ্রধান। বাউল গান একতারা, গোপীযন্ত্র এবং খঞ্জনী বা করতাল লইয়া গীত হয়। কীর্ত্তনে খোলের সঙ্গত চলে। কীর্ত্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এক এক পদের সুর ও তাল উভয়ই পরিবর্ত্তিত হয়। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে বাউল ও কীর্ত্তনের স্থান অনেক উচ্চে।

আলাপ

রাগের স্বরবিন্যাসকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করার নাম আলাপ। ধ্রুপদ খেয়াল ও টপ্পার রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন আলাপ হয়। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি তুকেই আলাপ হইয়া থাকে, কণ্ঠেও আলাপ করা হয়, আবার যন্ত্রেও আলাপ হইয়া থাকে। অন্তরের প্রেরণায় গায়ক ও বাদক রাগের মূর্ত্তি সকলপ্রকার গীত-অলঙ্কার সংযোজন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। আলাপে গানের পদ ব্যবহৃত হয় না। আলাপ করিতে তোম্ তানা, নেরি, তা, তুম্ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা রাগের সুকৌশল স্বরবিন্যাস রচনা করিতে হইবে। ইহাতে তালের বন্ধন নাই। কিন্তু স্বরবিন্যাসটিতে কোন ছন্দবন্ধ না থাকিলেও তাহাতে লয় আছে। বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত এই তিন লয়েই আলাপ হইয়া থাকে।

কণ্ঠ খুব মার্জ্জিত না থাকিলে ও রাগের স্বরবিন্যাস বিশদভাবে জানা

না থাকিলে আলাপ করা সম্ভবপর হয় না। এক এক রাগের অনেক ঢংয়ের গান জানা না থাকিলেও আলাপ বিস্তার করিতে পারা যায় না। এই জন্যই আলাপ সব চেয়ে কঠিন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত-ইতিহাস

সুর, নৃত্য ও তালের জন্মকথা

সঙ্গীতের জন্ম কি ভাবে ও কোথা হইতে হইল তাহা খুব গোড়া হইতে জানিতে গেলে দেখা যায় যে, মানুষ হৃদয়ের আবেগে যে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইতেই গীতের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা চলিবার ভঙ্গীদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। বালকবালিকাগণ আনন্দিত হইলে লাফালাফি করিয়া তাহা প্রকাশ

করে। এই অঙ্গভঙ্গী, চলিবার গতি বা লম্ফঝম্ফ একটা সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত হইলেই নৃত্য হয় এবং এই সুশৃঙ্খল নিয়মটাই তাল বা ছন্দ। অসভ্য জাতিদের কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইহারা যেরূপ অস্পষ্ট ধ্বনি করিয়া কথা বলে, সভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ অসভ্য জাতিগণ এইরূপ করিয়াই কথা বলিত। এই অস্পষ্ট ধ্বনি হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আমাদের এইরূপ ভাষায় পরিণত হইয়াছে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে নৃত্য-গীত খুব প্রচলিত। প্রায় সমস্ত অসভ্য জাতিই একই সুর ক্রমাগত আবৃত্তি করে মাত্র। সুরের কোন পরিবর্ত্তন নাই। একই সুরে ইহারা নৃত্য করিয়া ঝোঁক্ দিয়া দিয়া গীত করিয়া থাকে। অসভ্য জাতি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্বরবিন্যাস রচনা করিতে পারে না। এইরূপ সঙ্গীত হইতেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাতটি সুর ক্রমে বারটি সুরে পরিণত হইয়াছে এবং নানাপ্রকার স্বরবিন্যাস রচিত হইয়া সঙ্গীত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বেদ উৎপত্তির সময় হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। মুনিঋষিগণ বেদ-গান করিতেন। সামবেদ সুর করিয়া পড়িতে হয়। বেদ বহু প্রাচীন, কাজেই সঙ্গীতও অতি প্রাচীন। বেদ উৎপত্তির সময় হইতেই ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেবই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা। মহাদেব ব্রহ্মাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা পরে ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তুম্বুরু এই পাঁচজনকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ভরত মুনি দ্বারাই সঙ্গীত ভারতে প্রচারিত হয়।

ধ্রুপদ ও পাখোয়াজ

মহাভারতের সময়েও সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষভাবে হইত। কারণ মহাভারতে দেখা যায় যে, পঞ্চপাণ্ডব যখন বভ্রুবাহনের রাজ্যে ছিলেন, তখন অর্জ্জুন মহারাজার কন্যাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, তৎসময়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। সেই সময়ে ভগবানের নামকীর্ত্তনের জন্যই সঙ্গীত হইত। ধ্রুপদই আরাধনার উপযোগী। কাজেই তখন ধ্রুপদই ছিল একমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত। মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ দিয়াই গীতে সঙ্গত করা হইত। মৃদঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহাদেব ব্রহ্মাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার সময় ব্রহ্মার তালজ্ঞান জন্মাইবার জন্য মহাদেব মাটি দিয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ার করেন। মাটি হইতে তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম মৃদঙ্গ (মৃৎ+অঙ্গ) হইয়াছে। মৃদঙ্গ পরে কাঠ দিয়া তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয়। তখন ইহার নাম পাখোয়াজ হয়। পাকা+আওয়াজ হইতেই পাখোয়াজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পাখোয়াজের আওয়াজ গুরুগম্ভীর। ধ্রুপদ গানও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। সেইজন্য ধ্রুপদ গানে পাখোয়াজ দিয়াই সঙ্গীত করা হয়। এখন মৃদঙ্গ অন্য প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। কীর্ত্তনগানে ইহা দ্বারা সঙ্গীত হইয়া থাকে। ইহার আধুনিক নাম খোল।

মুসলমান রাজত্বকালে সঙ্গীত

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সঙ্গীতের অধঃপতন হইয়াছিল। মুসলমানদের রাজত্বকালে তাহা পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে এক ধ্রুপদই গীত হইয়া আসিতেছিল। পরে ইহাদের রাজত্বকালেই সঙ্গীত সমধিক উৎকর্ষলাভ করিয়া নানা ভাবে বিভিন্ন হইয়াছে।

খেয়ালের সৃষ্টি

পাঠান-রাজ আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় হইতেই প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীতের উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। আলাউদ্দীনের সময় হইতে গিয়াস্‌উদ্দীন তোগলকের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। আলাউদ্দীন খিলিজী অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহার দরবারে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ থাকিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। তন্মধ্যে নায়ক গোপাললাল ও নায়ক আমীর খস্‌রুই প্রধান। এই দুই জনই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া নায়ক উপাধি লাভ করেন। ধারু ধ্রুপদ নায়ক গোপাললাল সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমীর খস্‌রু তেলানা ও খেয়াল গীতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে তেলানা ও খেয়াল গীত ভারতীয় সঙ্গীতে স্থান পায় নাই। আমাদের বাউল ও কীর্ত্তনের মত দিল্লীর দেশী গীতরূপে প্রচলিত ছিল। আমীর খস্‌রু সঙ্গীতে রাগরাগিণীর সঙ্গে পারস্য দেশীয় রাগরাগিণী মিশ্রিত

কতকগুলি রাগরাগিণী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই দুইজন সঙ্গীতজ্ঞই আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় হইতে গিয়াস্‌উদ্দীন তোগলকের সময় পর্য্যন্ত ছিলেন।

বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি

আমীর খসরু কেবল খেয়াল গীত-প্রণালী সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গীতে সঙ্গত করিবার জন্য যন্ত্রও সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ধ্রুপদ গীত পাখোয়াজের সঙ্গতেই শ্রুতিমধুর হয়। কারণ দুইটিই গম্ভীরাত্মক। কিন্তু খেয়াল গীতের হাল্‌কা গতি হওয়াতে পাখোয়াজের সঙ্গতে তাহা শ্রুতিমধুর হয় না। সেইজন্য পাখোয়াজ ভাঙ্গিয়া আমীর খস্‌রু বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

সেই সময় হইতে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দুইজন গায়কশ্রেষ্ঠের পরিচয় পাই। একজনের নাম নায়ক বৈজুনাথ ও অপরের নাম রামদাস। নায়ক বৈজুনাথ, বৈজু বাওরা নামে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বাওরা অর্থে পাগল। তিনি সঙ্গীতে সর্ব্বদা মত্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে বাওরা বলা হইত। রামদাসরচিতও অনেক ধ্রুপদ গীত দেখা যায়। এই দুইজনই ছিলেন তৎকালীন অসাধারণ সঙ্গীতমনীষী।

ইহার পরে মোগল সম্রাট্ আক্‌বরের রাজত্বকালে সঙ্গীতের সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাস্তবিক ১৫৫৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের সঙ্গীতচর্চ্চাই ভারতীয় সঙ্গীতকে নবজীবন দান করে। আক্‌বর নিজেও সঙ্গীতবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার সময়ে বহু সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ তান্‌সেনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তান্‌সেন

তান্‌সেন প্রথমে ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তাঁহার নাম রামতনু। পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। তান্‌সেন বৃন্দাবন নিবাসী অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি শের শাহ্‌র পুত্র দৌলত খাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে অনেক গান রচনা করিয়া যান। তিনি সঙ্গীত শিক্ষা শেষ করিয়া রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র সিংহের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহাকে 'তান্‌সেন' উপাধি দেওয়া

হয়। ‘তান্’ কথার অর্থ স্বরের বিস্তার আর ‘সেন’ অর্থ চিহ্ন। তানই যাঁহার চিহ্নস্বরূপ তিনিই তান্সেন।

রাজারামের সভা হইতে তান্সেনকে সম্রাট্ আক্বরের দরবারে আসিতে হয়। তিনি তখন এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও মীর্জ্জা উপাধি গ্রহণ করেন। তান্সেনের মত গায়ক সেই সময়ে কেহ ছিল না। তিনি অসংখ্য গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সব গীত এখনকার ধ্রুপদ-গায়কদের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তিনি যোগিয়া, আশাবরী, দরবারী-কান্ড়া, আড়ানা, বেহাগড়া, ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

তান্সেনের সমসাময়িক গায়ক ছিলেন মালবের সিংহাসনচ্যুত সুলতান বজ্ বাহাদুর। তিনি গলা চাপিয়া গান করিতেন। এই প্রকার গলা চাপিয়া গান করাকে ‘বাজখাই’ পদ্ধতি বলা হয়। রামদাসের পুত্র সুরদাস, ধোঁধি খাঁ, সুরয খাঁ, শোভন খাঁ, চাঁন খাঁ, প্রভৃতি বহু সঙ্গীতজ্ঞ আক্বরের সময়ে ছিলেন।

জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের সময়েও সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষভাবে হইয়াছিল। তৎকালে বিলাস সেন, স্থরথ সেন, গুণসেন, তান্তরঙ্গ, মানতরঙ্গ, মানদাস, লক্ষ্মণদাস, জানকীদাস, প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই ভারতীয় সঙ্গীতের অধঃপতন হয়। ঔরঙ্গজেব সঙ্গীতবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও রাজ্য হইতে যাহাতে সঙ্গীত একেবারে লোপ পায় তাহার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন প্রাতে কয়েকজন লোক একটা মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল, ঔরঙ্গজেব তাহা দেখিয়া কে মারা গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলি উত্তরে বলিল যে, লোকটি একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। শুনিয়া ঔরঙ্গজেব না-কি বলিয়াছিলেন, ‘তাহাকে ভাল করিয়া মাটি চাপা দাও, যেন আবার না উঠিয়া পড়ে। আবার উঠিলেই যত গোল বাধিবে।’

আলাউদ্দীন খিলিজীর রাজত্বকাল হইতে শাজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের কতকগুলি রাগরাগিণীর সঙ্গে নানা রাগরাগিণী ঈষৎ মিশ্রিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। আক্‌বর কান্‌ড়া রাগিণী শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেইজন্য তাঁহার সভা-গায়কগণ কান্‌ড়ার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কান্‌ড়াকে আঠার প্রকার করিয়াছেন। কান্‌ড়া আক্‌বরের প্রিয় ছিল বলিয়াই ইহার নাম দরবারী-কান্‌ড়া হইয়াছে। কান্‌ড়ার মত আরও কয়েকটি শ্রুতিমধুর রাগরাগিণীকে প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। কান্‌ড়াকে আঠার প্রকার, তোড়ীকে তের প্রকার, মল্লারকে তের প্রকার, নটকে নয় প্রকার ও সারঙ্গকে সাত প্রকার করা হইয়াছে।

ইহাদিগকে যথাক্রমে অষ্টাদশ-কান্‌ড়া, ত্রয়োদশ তোড়ী, ত্রয়োদশ-মল্লার নব-নট ও সপ্ত-সারঙ্গ বলা হয়। কি কি রাগরাগিণী কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

কান্‌ড়া — দরবারী-কান্‌ড়া, নায়কী-কান্‌ড়া, মুদ্রা-কান্‌ড়া, কৌশকী-কান্‌ড়া, হোসেনী-কান্‌ড়া, সুঘরাই-কান্‌ড়া, কাফি-কান্‌ড়া, শ্যাম-কান্‌ড়া, গারা-কান্‌ড়া কোহল-কান্‌ড়া, টঙ্ক-কান্‌ড়া মিয়াকী-জয়জয়ন্তী, আড়ানা, বাহার, সাহানা ও বাগেশ্রী।

তোড়ী — দরবারী-তোড়ী, বাহাদুরী-তোড়ী, নচারী-তোড়ী, লক্ষ্মী-তোড়ী, খট-তোড়ী, দেশী-তোড়ী, মুদ্রা-তোড়ী, সূহা-তোড়ী, সুঘরাই-তোড়ী, জৌনপুরী-তোড়ী, আশাবরী, গুর্জ্জরী ও গান্ধারী।

মল্লার — শুদ্ধ মল্লার, মেঘ, সুরট, দেশ, গৌড়, জয়-জয়ন্তী, ধূরিয়া-মল্লার, রামদাসী-মল্লার, সুরদাসী-মল্লার, নট-মল্লার, অরুণ-মল্লার, মিয়া-মল্লার ও ঝাঁঝ-মল্লার।

নট — নট-নারায়ণ, ছায়ানট, কদম্ব-নট, অরুণ-নট, আহীর-নট, কেদার-নট, হাম্বীর-নট, কামোদ-নট ও কল্যাণ-নট

সারঙ্গ — বৃন্দাবনী-সারঙ্গ, মধুমাত-সারঙ্গ, গৌড়-সারঙ্গ, সামন্ত-সারঙ্গ, বড়হংস-সারঙ্গ, সুর-সারঙ্গ ও মিয়া-সারঙ্গ।

মহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকালে পুনরায় সঙ্গীতের উত্থান আরম্ভ হয়। সেই সময়ে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রভৃতি অদ্বিতীয় গায়কগণ সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করেন। সারঙ্গ রচিত অনেক খেয়াল গান আছে। ঐ সময় হইতে খেয়াল গান নবজীবন প্রাপ্ত হয়। জৌনপুরের রাজা সুলতান হোসেন সির্কী রচিতও অনেক খেয়াল গান দেখা যায়। বস্তুতঃ, সদারঙ্গ ও সুলতান হোসেন সির্কী এই দুইজন সঙ্গীতাচার্য্যের প্রভাবেই খেয়াল ভারতীয় সঙ্গীতভুক্ত হয়। আমীর খশ্‌রু তাহা সৃষ্টি করিলেও সমগ্র ভারতে খেয়াল সে সময়ে প্রচলিত ছিল না। তখন পর্য্যন্তও তাহা দিল্লীর দেশী গীতরূপে ছিল। এই হিসাবে সদারঙ্গ ও সুলতান হোসেন সির্কী খেয়ালের দ্বিতীয় জন্মদাতা।

টপ্পার সৃষ্টি

সেই সময়েই গোলাম নবী নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শোরী মিয়া। শোরী মিয়া ও গোলাম নবী এই দুইজনই টপ্পা গীতের সৃষ্টি করেন। টপ্পা যে রীতিতে গাওয়া হয়, পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণীর উষ্ট্রচালকগণ এই রীতিতে গান করিত। গোলাম নবী এই পদ্ধতিকে মার্জ্জিত করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতভুক্ত করেন। গোলাম নবী তাঁহার স্ত্রী শোরী মিয়াকে ইচ্ছা করিয়া বহুদূরে রাখিয়া বিরহ-সঙ্গীত লিখিতেন ও গীতে ভণিতা শোরী মিয়ার নামে দিতেন। তাঁহার অধিকাংশ গানই শোরীর নামে ভণিতা লিখিত। কয়েকটি গান গোলাম নবীর নিজ নামেও দেখা যায়। শোরী মিয়ার নিজের রচিত গানও আছে। তাহাতে মিয়া সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছে। তাহা সবই শোরীর টপ্পা নামে বিখ্যাত। সেই সময়ে হম্‌দম্ সারসার প্রভৃতি কয়েকজনও শোরীর টপ্পা গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। টপ্পা গীতের সঙ্গেও বাঁয়া-তবলার সঙ্গতই হয়। কারণ টপ্পার গতিও খেয়াল গীতের মত হাল্‌কা। টপ্পার সৃষ্টি মহম্মদ শাহ্‌র কালেই, অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দের পরে।

ঠুম্‌রীর সৃষ্টি

ইহার অনেক পরে লক্ষ্ণৌ নগরে ঠুম্‌রী গানের সৃষ্টি হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ প্রথম ঠুম্‌রী গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামক দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিন

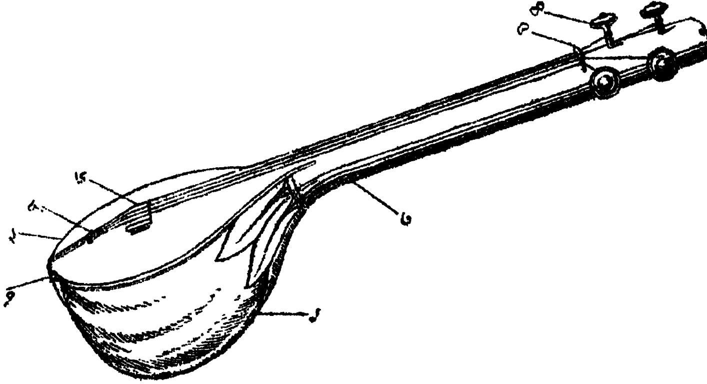
জনই ঠুম্‌রী গায়ক ও গীত-রচয়িতা ছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলী খুব নৃত্য করিতে পারিতেন। দয়াসখী, কৃপাসখী প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ উৎকৃষ্ট ঠুম্‌রী গান রচনা করিয়া সঙ্গীত-জগতে যশস্বী হইয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত কথাচ্ছলে যে কয়েকজন সঙ্গীতবিশারদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞের গান সঙ্গীতজগতে প্রচলিত আছে। আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় হইতে সমস্ত প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতাগণের গান আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ওস্তাদগণ তাঁহাদের রচিত গানই গাহিয়া থাকেন। এইসব গান হিন্দী, পঞ্জাবী, আর্‌বী ও পারসী ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাতেও ঐসব গানের অনুকরণে গীত সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালীভক্ত রামপ্রসাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকের রচিত কতক ধ্রুপদ, খেয়াল আছে। (নিধুবাবুর টপ্পা প্রসিদ্ধ। বাংলাতে শোরী মিয়ার অনুকরণে টপ্পা গীত তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। নিধুবাবুর প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের রচিতও কয়েকটি টপ্পা গীত আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তানপূরা-পরিচয়

আমাদের দেশে তানপূরার সাহায্যে গীত করিবার রীতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহার শুদ্ধ নাম তাম্বুরা। চলিত ভাষায় ইহাকে তানপূরাই বলা হয়। যাহার মধ্যে তান্ পরিপূর্ণ তাহাই তান্পূরা—এইরূপ অর্থেই এই নাম ব্যবহৃত হয়। এখানে তানপূরার অংশগুলির পরিচয় দিতেছি। তানপূরা-পরিচয়



১। এক নম্বর পদার্থটিকে তুম্ব বা বাউল বলা হয়। ইহা শুদ্ধ লাউয়ের খোলা দিয়া প্রস্তুত করা।

২। দুই নম্বর পদার্থটিকে তব্‌লী বলে। ইহা কাঠ দিয়া প্রস্তুত করে এবং ইহা তুম্বের সঙ্গে উত্তমরূপে সংযুক্ত থাকে।

৩। তিন নম্বর পদার্থটি তব্‌লী ও বাউলের সঙ্গে সংলগ্ন, ইহার ভিতর খোলা। ইহার নাম ডাণ্ডী।

৪। চার নম্বর পদার্থটি যন্ত্রের খুঁটি বা কান। তানপূরায় মাত্র চারটি তার থাকে। তারগুলি কানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এজন্য কানের দরকার হয়।

৫। পাঁচ নম্বর পদার্থ হাড়ের বা হাতীর দাঁত দিয়া তৈয়ারী, ইহার নাম আড়ী।

৬। ছয় নম্বর পদার্থটি তব্‌লীর উপর একটি ছোট চৌকী, ইহার নাম সোয়ারী।

৭। সাত নম্বর পদার্থটি তুম্বের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহার নাম পন্থি। তারগুলির একটা দিক এই পন্থির সঙ্গে বাঁধিতে হয় এবং ইহারা সোয়ারীর উপর দিয়া আড়ীর মধ্যবর্ত্তী ছিদ্র দিয়া গিয়া কানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কানগুলি ঘুরাইয়া খাদ ও চড়া স্বর বাহির করা হয়।

৮। আট নম্বর পদার্থগুলির নাম ম্যান্‌কা। এইগুলি প্রতি তারের সঙ্গে সংলগ্ন, এইগুলি সোয়ারী ও পন্থির মধ্যভাগে তব্‌লীর উপর থাকে। ম্যান্‌কাগুলি ছোট ছোট মারবেল্। ইহাদের মধ্য ভাগে একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া তারগুলি প্রবেশ করাইয়া লইতে হয়। স্বরের ঈষৎ পরিবর্ত্তন (খাদে বা চড়ায়) করিতে হইলে ম্যান্‌কাগুলির দরকার হয়।

তানপূরা বন্ধন ও ধারণ

তানপূরাতে চারিটি তার থাকে। যাহার কণ্ঠ যেরূপ, অর্থাৎ যে যে-স্বরকে খরজ করিয়া গান করে, তানপূরার মধ্যবর্ত্তী দুইটি তার সেই স্বরে বাঁধিতে হয়। 'খরজ পরিবর্ত্তন' পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, গায়ক এমন একটি স্বরকে খরজ করিয়া লইবে, যাহা হইতে খাদের দিকে এবং চড়ার দিকে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়। যে-স্বরটিকে খরজ ধরা হইবে তাহাই মুদারার সা হইবে। খাদের দিকে তাহার পরবর্ত্তী স্বরটিই উদারা হইবে এবং খরজের পরবর্ত্তী চড়া স হইতে তারা সপ্তক আরম্ভ হইবে। সাধারণতঃ উদারার

মধ্যম ও তাহার পঞ্চম স্বুর গলায় আসিলেই সব গীত করা যায়। আলাপ করিতে উদারার সব কয়টি স্বুরই কণ্ঠ হইতে উচ্চারণ করিতে হয়। যাহা হউক, কণ্ঠের ওজন অনুযায়ী তানপূরার মধ্যের দুইটি তার মুদারার সা করিয়া লইতে হইবে, এই তার দুইটিকে জুড়ির তার কহে। জুড়ির তার দুইটি লৌহ-নির্ম্মিত হইবে। জুড়ির তার কণ্ঠের ওজনে বাঁধিয়া ইহাদের বামদিকের তারটি খাদপঞ্চমে বাঁধিতে হয়। জুড়ির তার হইবে মুদারার সা আর বামদিকের তারটি হইবে উদারার পা। এই তারটি পিতলের তৈরি হওয়া চাই। ডান-দিকের তারটি জুড়ির খাদের ষড়জ স্বুরে, অর্থাৎ উদারার স স্বুরে বাঁধিতে হয়। ইহাও পিতলের মোটা তার হওয়া দরকার।

প্রথমে কণ্ঠের ওজন অনুযায়ী মুদারার স জুড়ির তারে বাঁধিতে হয়। তারপর সেই অনুপাতে বামদিকের তারটি উদারার প স্বুরে ও ডান দিকের তারটি উদারার স স্বুরে বাঁধিতে হইবে।

গান করিবার সময় তানপূরার তুম্ব কোলের উপর রাখিয়া ডানদিকের বঁধের উপর যন্ত্রের ডাণ্ডী রাখিতে হয়। কাঁধের একটু উপর ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলী দিয়া প স্বুরের তার দুটি স স্বুরের তারের উপর পর পর আঘাত করিতে হয়। তারের উপর আঘাত যেন খুব জোরে না পড়ে। মৃদু আঘাতেই ভাল আওয়াজ হয়। এস্রাজ, সারেঙ্গী বা বেহালা ইত্যাদির ন্যায় তানপূরা দিয়া সবটি গান বাজাইতে পারা যায় না। গান গাহিবার সময় কেবল ক্রমান্বয়ে তারগুলির উপর আঘাত করিতে হয়। তানপূরা স্বুর রাখিবার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়।

হারমোনিয়মে গান করা উচিত নয় কেন

পূর্ব্বে শ্রুতিহিসাবে স্বরঅন্তর কিরূপ তাহা দেখান হইয়াছে। তাহাই প্রকৃত স্বরঅন্তর, কিন্তু হারমোনিয়মের স্বরঅন্তর ও শ্রুতিহিসাবে স্বরঅন্তরের মধ্যে অনেক প্রভেদ। শ্রুতিহিসাবে স্বরঅন্তর তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ— বৃহদন্তর, মধ্যান্তর ও ক্ষুদ্রান্তর, কিন্তু হারমোনিয়মে বৃহদন্তর ও ক্ষুদ্রান্তরবিশিষ্ট (পূর্ণান্তর ও অর্দ্ধান্তর) করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞগণ এক অষ্টকের ধ্বনিরেখাকে তিপ্পান্নটি সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, স হইতে র-এর অন্তরসংখ্যা ৯; র হইতে গ-এর ৮; গ হইতে ম-এর ৫; এবং ম হইতে প ৯; প হইতে ধ ৮; ধ হইতে ন ৯; ও ন হইতে চড়া স ৫ হইবে। যথা :—

৯	৮	৫	৯	৮	৯	৫	= ৫৩

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্স

কিন্তু হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, পিয়ানো ইত্যাদি যন্ত্রের স্বরগ্রাম উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী নহে। কোন কারণে ইহাদের সুরগুলিকে কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক করিয়া কৃত্রিম গ্রাম করিতে হইয়াছে। এক অষ্টকের ধ্বনিরেখাকে তিপ্পান্ন অংশে বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত স্বরঅন্তরহিসাবে সুর করা হইয়াছে।

৮ ৫/৬	৮ ৫/৬	৪ ৫/১২	৮ ৫/৬	৮ ৫/৬	৮ ৫/৬	৪ ৫/১২	= ৫৩

স	১	র	১	গ	½	ম	১	প̇	১	ধ	১	ন	½	স̇

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হারমোনিয়মের সুর কৃত্রিম, প্রকৃত নহে। তার উপর একটি পূর্ণান্তর সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, অর্থাৎ ৮ ৫/৬ অংশকে দুই ভাগ করিয়া ৪ ৫/১২ ভাগে কড়ি-কোমলের সুর করা হইয়াছে। ইহাতে এই অসুবিধা হইয়াছে যে, কান্‌ড়ার ধো বা গো হারমোনিয়মে সঠিক ভাবে বাজান যায় না। এইরূপ প্রত্যেক রাগরাগিণীতেই একটা-না-একটা ভুল দেখা যায়।

আমাদের সঙ্গীতের একটা বিশেষত্ব এই যে, একটা সুর আর একটা সুরের সঙ্গে একটানা ভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু হারমোনিয়মের কাটা কাটা সুর হওয়াতে সুরগুলি পৃথক হইয়া পড়ে।

কান যাহা শুনিতে পায় কণ্ঠ তাহাই অজ্ঞাতে অনুসরণ করে। একটা কর্কশ আওয়াজ কানের অতি নিকটে বাজিতে থাকিলে কণ্ঠও কর্কশ হইয়া পড়ে। কাজেই হারমোনিয়মের কৃত্রিম সুর কানের কাছে বাজিতে থাকিলে কণ্ঠও তাহাই অনুসরণ করে ও কণ্ঠে কৃত্রিম সুর বসিয়া যায়। তারপর ভেজাল জিনিষ সর্ব্বদা খাইয়া যেমন খাঁটি জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া

যায় সেইরূপ সর্ব্বদা হারমোনিয়মের আওয়াজ কানের নিকটে বাজিতে থাকে বলিয়া কোন্‌টা প্রকৃত ও কোন্‌টা কৃত্রিম সুর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না।

তারপর উপর, বাজারে-হারমোনিয়মের আওয়াজ কর্কশ বিলাতী হারমোনিয়মগুলির সুরে কিছু মিষ্টত্ব আছে। কিন্তু তাহাদের মূল্য অত্যন্ত বেশী বলিয়া বাজারের সস্তা কর্কশ আওয়াজযুক্ত হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইতেছে। এখন কর্কশ আওয়াজযুক্ত যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত করিলে কণ্ঠও কর্কশ হইয়া পড়ে।

ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের গীত হারমোনিয়মের সাহায্যে সুচারুরূপে গাহিতে পারা যায় না। কারণ ঐ সব গানে সুরের কাজ অত্যন্ত বেশী করিতে হয়। গীতের সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজাইয়া এবং তাল দিয়া সুরের কাজ তত করিতে পারা যায় না।

আবার যদি অন্য কেহ গীতের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজাইয়া যায় তাহা হইলেও গীত সুমধুর হয় না বা গীতটি পূর্ব্বে একবার গাহিয়া বাদককে শুনাইতে হইবে। এরূপ নানা অসুবিধা দেখা যায়।

তানপূরা কেন ভাল

কিন্তু তানপূরাতে চারিটি তারে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া যাইতে হয় মাত্র। কাজেই তানপূরাতে গায়ক তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী গীত করিতে পারেন এবং বাঁ-হাত দিয়া তুম্বের উপর তাল দিতে পারেন।

সবচেয়ে ভাল সারেঙ্গী বা বেহালার সঙ্গে সঙ্গত করিয়া গান করা উচিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজে যন্ত্র বাজাইয়া উত্তমরূপে গাওয়া যায় না। অন্য একজন গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজাইলে চলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি অসুবিধা হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইজন্য তানপূরার সাহায্যে গান করাই শ্রেয়।

অনেকের মনে এই কথা হইবে যে, তানপূরায় মাত্র দুইটি সুর আছে,— স ও প; কিন্তু খুব মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা প্রায় সব কয়টি সুরই পাই। প্রথম পঞ্চমের তারে আঘাত করিলে সুর পঞ্চম হইতে মীড়যোগে ঋখব সুরে অবরোহণ করিয়া পুনঃ প-তে আসিয়া দাঁড়ায়। আবার

পঞ্চম তারে আঘাত করিয়া জুড়ির তারে আসিলেই ম স্বুর পাই। তখন পঞ্চমের তার ষড়জ হইয়া দাঁড়ায় ও জুড়ির তার মধ্যম হয়। যেন স‿ম একটা মীড়। আবার জুড়ির তার হইতে ষড়জের তারে আঘাত পড়িলেই তাহা স গ র স ধ্বনি করে। প্রত্যেকটি তারই কেবল একটা স্বুর ধ্বনিত হয় না। যে-স্বুরে তারটি বাঁধা থাকে, সেই স্বুরের খাদে ও চড়ায় কয়েকটি স্বুরই ধ্বনিত করে। একটা তারে আঘাত করিলেই তাহার কম্পনসংখ্যা বাড়িয়া ও কমিয়া দুই-একটা স্বুর খাদে ও চড়ায় গিয়া ক্রমে শুদ্ধ ও কড়ি-কোমলের স্বুরগুলি একটানাভাবে ধ্বনিত করে ও শেষে যে-স্বুরে তারটি বাঁধা থাকে, সেই স্বুরে আসে ও ক্রমে স্বুর ক্ষীণ হইয়া মিশিয়া যায়। এইজন্য তানপূরার চারি তার হইতেই আমরা শুদ্ধ ও বিকৃত বারটি স্বুর পাই।

আবার আমরা জানি, স মূল স্বুর। এক স স্বুর হইতেই সব স্বুরের উৎপত্তি। এইজন্য প্রত্যেক স্বুরের সঙ্গেই স-এর সম্বন্ধ আছে। এ স-কে বাঁধিয়া লইলেই চলিতে পারে। যেমন, একতারাতে মাত্র খরজের তারই বাঁধা আছে।

তানপূরার তারগুলি সাধারণতঃ যে আওয়াজ করে তাহা খুব মৃদু হয়। স্বুর জোর করিবার জন্য প্রত্যেকটি তারে স্বুতার একটা আংটি পরাইয়া তাহা সোয়ারীর উপর রাখিতে হয়। স্বুতার আংটিটি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যেন তারে আঘাত করিবামাত্র তার সোয়ারীর উপর ঘর্ষিত হয়। তাহাতেই আওয়াজ জোর হয়। এইরূপ করাকে স্বুর-জোয়ারী করা বলে, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তানপূরা জোয়ারী করিয়া গীত সাধনা করা উচিত নহে। কারণ, জোয়ারী করিলে তানপূরা হইতে ঝন্‌ঝনে আওয়াজ বাহির হয়। ইহা কর্কশ ধ্বনি। প্রথম শিক্ষার্থীর কণ্ঠ অজ্ঞাতে ঐরূপ ধ্বনি অনুসরণ করিয়া কণ্ঠমাধুর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে যন্ত্রনির্ম্মাতাগণও এখনও জানেন না যে, কিরূপে যন্ত্রের আওয়াজ জোরাল করা যায়। পাশ্চাত্য দেশবাসী বলেন যে, সোয়ারী যত শক্ত কাঠের বা জিনিষের হইবে ধ্বনিও ততই মৃদু হইবে। আর সোয়ারী যদি নরম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট (porous wood) কাঠের হয়

ধ্বনি ততই প্রবল হয়। আমাদের দেশে সোয়ারী শক্ত কাঠ বা হাতীর দাঁত দিয়া তৈরি হয়, সেইজন্য ধ্বনি মৃদু হয়। শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত কাঠ দিয়া সোয়ারী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ভাল হয়। আর একটি কথা এই যে, তানপূরার তুম্বটি যত বড় হইবে আওয়াজও তত গমকপূর্ণ হইবে। গমকপূর্ণ তানপূরাই ব্যবহার করিতে হয়।

প্রথম শিক্ষার্থীর সুরজ্ঞান জন্মিলে কয়েকটি গান শিখিয়া পরে তানপূরা লইতে হয়। প্রথমেই তানপূরা লওয়া উচিত নহে। হারমোনিয়ম লইয়া গান করিতে হইলে তাহা আস্তে বাজাইয়া গান করা উচিত। যেন গলার স্বরের উপরে হারমোনিয়মের আওয়াজ না উঠে। অনেকে এত জোরে বেলো (bellow) করিয়া বাজান যে তাহাতে কণ্ঠস্বর ঢাকিয়া ফেলে। পরে এইরূপ হয় যে, হারমোনিয়ম ছাড়া গলায় আওয়াজই আসে না। হারমোনিয়মের সঙ্গে গান করিতে হইলে গানের দিকে সম্পূর্ণ মন দিয়া গাহিতে হইবে। অনেকে গীত করিতে করিতে নানাবিধ কৌশল করিয়া হারমোনিয়ম বাজাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে এই হয় যে, সুরের দিকে তত মনোযোগ থাকে না এবং গান সুমধুর হয় না। সবচেয়ে ভাল, কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া গান করা—এইরূপ করিলে যেখানে সেখানে সুচারুরূপে গান করিতে পারা যায়।

তানপূরা লইয়া সাধনা করার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখিতে হইবে যন্ত্রটির সুর উত্তমভাবে বাঁধা কি-না। তানপূরার বন্ধন খুব ভাল না হইলে সঙ্গত করিয়া সুখ পাওয়া যায় না। তানপূরার তারগুলি বাঁধিয়া চারি তার ধ্বনিত করিলে যদি সুরের রেশ কাঁপিতেছে বুঝা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সুরের মিল হয় নাই। আর যদি সুরের রেশ অকম্পিত অবস্থায় থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, সুরের সূক্ষ্ম মিল হইয়াছে। তানপূরার বন্ধন শিক্ষা করিতে হইলে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে। ওজন মত সুর নিজে নিজে ঠিক করা প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে খুব কঠিন। তানপূরায় উত্তম সুর বন্ধন থাকিলে ইহার রিন্ ঝিন্ ধ্বনি কানের কাছে যখন বাজিতে থাকে তখন বড়ই আনন্দ পাওয়া যায়। এইজন্য তানপূরার সাহায্যে গান করা উচিত। তানপূরাই ভারতীয় হারমোনিয়ম।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বর-রহস্য

সূক্ষ্ম স্বরঅন্তর

সর্ব্বপ্রথমে হারমোনিয়মের কী-বোর্ড অনুযায়ী স্বরঅন্তর দেখান হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে শ্রুতিহিসাবে স্বরঅন্তর দেখান হইয়াছে। এখন পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতে সূক্ষ্ম স্বরঅন্তর কিরূপ তাহা দেখাইতেছি।

প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে, স্বাভাবিক স্বরগ্রামকে অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে স হইতে র-এর অন্তর যদি ৫১ হয় তবে র হইতে গ-এর অন্তর ৪৬ ও গ হইতে ম-এর অন্তর ২৮ হইবে। কাজেই ম হইতে প-এর অন্তর ৫১। প হইতে ধ-এর অন্তর ৪৬; ধ হইতে ন-এর অন্তর ৫১; এবং ন হইতে চড়া স̇-এর অন্তর হইবে ২৮।

৫১	৪৬	২৮	৫১	৪৬	৫১	২৮

স র গ ম প ধ ন স̇

এই অন্তর-বিভাগ হইতে মোটামুটিভাবেও স্বরঅন্তর ধরা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যেমন—

৯	৮	৫	৯	৮	৯	৫

স র গ ম প ধ ন স̇

কম্পন হিসাবে স্বরের অনুপাত

কম্পন হইতেই যে স্বরের উৎপত্তি তাহা কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং একটা স্বরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া চড়ার দিকে যাইতে থাকিলে কম্পন-সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট স্বর যতবার কম্পন হইতে উৎপন্ন হইবে, এই কম্পন-সংখ্যার দ্বিগুণ কম্পন-সংখ্যায় এমন একটি স্বর পাওয়া যায় যাহা সেই নির্দ্দিষ্ট স্বরের সঙ্গে একত্র বাজিতে থাকিলে দুইটি স্বরই যে বাজিতেছে তাহা বুঝা যাইবে না, অর্থাৎ

নির্দ্দিষ্ট সুরটি যদি সেকেণ্ডে চব্বিশটি কম্পন হইতে উৎপন্ন হয় তবে আটচল্লিশ বার কম্পন হইতে এমন একটি সুর পাওয়া যাইবে যে, দুইটি সুর একত্র বাজিলে তাহা এক সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। আমরা জানি যে, স সুর ও চড়া স বা খাদ স সুর একত্র ধ্বনিত হইলে একসঙ্গে মিশিয়া যায়। র সুর ও চড়া র বা খাদ র সুর অবিকল মিশিয়া যায়। এইরূপ উদারা সপ্তকের সুরগুলি মুদারা সপ্তকের সুরগুলির সঙ্গে ও মুদারা সপ্তকের সঙ্গে তারার সপ্তকের সুরগুলি অবিকল মিশিয়া যায়। এখন পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট সুরটি যদি স হয় ও তাহার কম্পন-সংখ্যা চব্বিশ হয় তবে চড়া স সুর আটচল্লিশটি কম্পন হইতে উৎপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, স-এর অনুরণন-বেগ এক হইলে চড়া স-এর অনুরণন-বেগ দুই হইবে ও অন্যান্য সুরগুলির অনুরণন নিম্নলিখিত অনুপাতে হইবে। যথা ঃ—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
১	১ ১/৮	১ ১/৪	১ ১/৩	১ ১/২	১ ২/৩	১ ৭/৮	২

এই অনুরণন-বেগ অনুযায়ী স-কে চব্বিশ কম্পনযুক্ত ধরিলে অন্যান্য স্বর-কম্পন কত হইবে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা ঃ—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮

সেকেণ্ডে চব্বিশ বার কম্পন হইলেই যে স সুর হইবে তাহা নহে। এখানে অনুপাতটি বুঝাইবার জন্য মাত্র চব্বিশ সংখ্যা লওয়া হইয়াছে। চব্বিশ স-তে ধরিলে অন্যান্য সুরের কম্পন-সংখ্যায় ভগ্নাংশ হয় না। এইজন্যই চব্বিশ স-তে ধরা হইয়াছে।

কম্পন হিসাবে স্বর-অন্তর

সুরের অন্তরগুলি কম্পন-সংখ্যা দিয়াও বিশেষভাবে বুঝান যায়। স হইতে র-এর অন্তর বাহির করিতে হইলে স-এর সংখ্যা দিয়া র-এর

কম্পন-সংখ্যাকে ভাগ করিলেই চলে। এই নিয়ম অনুসারে স্বরঅন্ত এইরূপ হয়। যথা :—

স্বর	কম্পন-সংখ্যা				অন্তর
স—র	২৪÷২৭	=	$\frac{২৭}{২৪}$	=	$\frac{৯}{৮}$
র—গ	২৭÷৩০	=	$\frac{৩০}{২৭}$	=	$\frac{১০}{৯}$
গ—ম	৩০÷৩২	=	$\frac{৩২}{৩০}$	=	$\frac{১৬}{১৫}$
ম-প	৩২÷৩৬	=	$\frac{৩৬}{৩২}$	=	$\frac{৯}{৮}$
প—ধ	৩৬÷৪০	=	$\frac{৪০}{৩৬}$	=	$\frac{১০}{৯}$
ধ—ন	৪০÷৪৫	=	$\frac{৪৫}{৪০}$	=	$\frac{৯}{৮}$
ন—র্স	৪৫÷৪৮	=	$\frac{৪৮}{৪৫}$	=	$\frac{১৬}{১৫}$

অতএব

	$\frac{৯}{৮}$		$\frac{১০}{৯}$		$\frac{১৬}{১৫}$		$\frac{৯}{৮}$		$\frac{১০}{৯}$		$\frac{৯}{৮}$		$\frac{১৬}{১৫}$	
স		র		গ		ম		প		ধ		ন		স

এখানেও তিনপ্রকার অন্তর-শ্রেণী পাওয়া যাইতেছে—

$\frac{৯}{৮}$ বৃহদান্তর, $\frac{১০}{৯}$ মধ্যান্তর ও $\frac{১৬}{১৫}$ ক্ষুদ্রান্তর।

স্বরগুলির মধ্যে এইরূপ অনুপাত কেন হইল, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। স্বরগুলির মধ্যে একটা সুন্দর মিল দেখা যায়। বাদী-সংবাদী বুঝাইতে কতক বলা হইয়াছে।

স্বরগুলির পরস্পর মিল

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ মিল চায়। সুরের মিল যে স্থানে তাহা মানুষের কানে মিষ্টি লাগে। স সুরের সঙ্গে চড়া র্স সুরের সবচেয়ে বেশী মিল। তারপরেই স-এর সঙ্গে প-এর মিল। তারপর ম-এর মিল। তারপর গ এর মিল।

এইসব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে হইলে দুইজন শিক্ষার্থী দুইটি তারের যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিলেই ভাল হয়। দুইটি যন্ত্রই একসুরে বাঁধা, দুইটি তারের যে-কোন একটিতে আঘাত করিলেই অন্য তারটি আপনা হইতেই কাঁপিয়া উঠে। ইহাকে sympathetic vibration বলে।

তারযন্ত্র দুইটি একসুরে আছে কি-না দেখিতে হইলে দুইটি যন্ত্র একত্র ঠেকাইয়া রাখিয়া একটি যন্ত্রের তারে একটা সুতার আঙটি পরাইয়া লইতে হইবে ও অন্য যন্ত্রের বাঁধা তারে আঘাত করিতে হইবে। যদি একসুরে দুই যন্ত্র বাঁধা থাকে তবে সুতার আঙটিটি নড়িয়া উঠিবে। যাহা হউক, একজন একটা যন্ত্রের স সুরই ক্রমাগত ধ্বনিত করিতে থাকিবে। অন্যজন প্রথমে ঐ যন্ত্রে ধ্বনিত স সুরের চড়া স সুর ধ্বনিত করিবে। তাহাতে দেখা যাইবে যে, দুই সুরই প্রায় একসুরে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিক্ষার্থী চড়া স হইতে অবরোহণ করিয়া ন সুর ধ্বনিত করিলে দেখা যাইবে যে, দুইটি সুরেরই পৃথক পৃথক ও অস্পষ্ট আওয়াজ হইতেছে। প্রথম জনকে ক্রমাগত স সুরই ধ্বনিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় জন ধ সুর ধ্বনিত করিলেও পৃথক পৃথক ও অস্পষ্ট আওয়াজ হইবে। প-তে আসিলেই দুইটি সুর বেশ মিশিয়া যাইবে ও স্পষ্ট আওয়াজ হইবে। তারপর ম-তে আসিয়াও মিল পাওয়া যাইবে এবং স্পষ্ট আওয়াজও হইবে। তারপর গ-তে অবরোহণ করিলেও বেশ কতক মিল হইবে। আবার র-তে অস্পষ্ট আওয়াজ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক গ্রামে প্রথম র্স—স-তে উত্তম মিল, স—প ও স—ম-তে মধ্যম মিল ও স—গ-তে ভাল মিল দেখা যায়।

প্রথমে আমরা স সুর নির্দ্দিষ্ট করি। স-ই মূল সুর, স হইতেই সব সুরের উৎপত্তি। অন্যান্য সুরগুলিকে স সুরের আত্মীয় সুর বলিতে পারি। স-কে ঠিক করিয়া আমরা তাহার দ্বিগুণ চড়া স সুরটি পাই, তাহার পরই আমরা প সুর পাই। সাতটি সুর কিরূপে পাই

স সুরের কম্পনের সংখ্যা ও র্স সুরের কম্পনের সংখ্যা যোগ করিয়া দুই দিয়া ভাগ করিলেই প সুরের কম্পন-সংখ্যা পাই। যেমন :—

$$\frac{\text{স}+\dot{\text{স}}}{২} = \text{প}; \qquad \frac{২৪+৪৮}{২} = ৩৬\ \text{প}$$

স্বরকম্পন-তালিকাতেও আমরা স সুরের চব্বিশ বার কম্পন হইলে প ছত্রিশ কম্পনযুক্ত হইবে, তাহা দেখিতেছি।

প সুর পাইয়া আমরা ইহার পর গ সুর পাই। উপরোক্ত অঙ্ক অনুযায়ী—

$$\frac{\text{স}+\text{প}}{২} = \text{গ} \qquad \frac{২৪+৩৬}{২} = ৩০ \text{ কাজেই গ} = ৩০$$

কাজেই স-কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমরা প্রথমে চড়া স সুর পাই ও পরে গ পাই। আবার চড়া স-কে সুর করিয়া যদি খাদের দিকে তাহার পঞ্চম সুর পর্য্যন্ত আসি তবে পাই ম সুর। যেমন—স হইতে প-এর অন্তরে তিনটি পূর্ণান্তরএ একটি অর্দ্ধান্তর আছে। স হইতে তাহার খাদে তিনটি পূর্ণান্তর ও একটি অর্দ্ধান্তর পরে আমরা ম সুর পাই।

ম-কে খরজবৎ ধরিলে চড়া স ম-এর পঞ্চম হয়।

আবার—

$$\frac{\text{ম}+\text{স}}{২} = \text{ধ} \qquad \frac{৩২+৪৮}{২} = ৪০ \text{ কাজেই ধ} = ৪০$$

এখানে আমরা ম ও ধ সুর পাইতেছি।

আবার—

$$\frac{\text{স}+\text{গ}}{২} = \text{র} \qquad \frac{২৪+৩০}{২} = ২৭ \text{ কাজেই র} = ২৭$$

এখানে আমরা র সুরটি পাইতেছি।

প-কে খরজ ধরিলে চড়া র সুর প-এর পঞ্চম হয়। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, স ও প-তে তিনটি পূর্ণান্তর ও একটি অর্দ্ধান্তর পাওয়া যায়। প হইতে চড়া র-তেও তিনটি পূর্ণান্তর ও একটি অর্দ্ধান্তর আছে। সাধারণতঃ চড়া র-তে ২৭ × ২ = ৫৪ কম্পন হইবে।

আবার—

$$\frac{প \times র্}{২} = ন \qquad \frac{৩৫ + ৫৪}{২} = ৪৫ \text{ কাজেই } ন = ৪৫$$

এখানে আমরা ন স্বুর পাইতেছি।

সুতরাং দেখা গেল, প্রথমে আমরা স-কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া স, প এবং গ স্বুর পাই। পরে ম ও ধ এবং সর্ব্বশেষে র ও ন স্বুর পাই। এইরূপে আমরা সাতটি স্বুর পাইয়াছি।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মূলসূত্র

প্রতীচ্যের সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে, ৪ : ৫ : ৬ বা ১০ : ১২ : ১৫ অনুপাতযুক্ত স্বর একত্র ধ্বনিত হইলেই কানে মিষ্টি লাগে।

স গ প এই তিনটি স্বুরই ৪ : ৫ : ৬ অনুপাতযুক্ত।

যেমন—

স	গ	প
২৪	৩০	৩৬

প্রত্যেকটি রাশি হইতে ৬ লইয়া গেলে আমরা পাই—

৪ : ৫ : ৬.

আবার—

ম	ধ	র্স
৩২	৪০	৪৮

প্রত্যেক রাশি হইতে ৮ লইলে ৪ : ৫ : ৬ হয়।

আবার

প	ন	র্র
৩৬	৪৫	৫৪

প্রত্যেক রাশি হইতে ৯ লইলে ৪ : ৫ : ৬ হয়।

কাজেই দেখা যায়—৪ : ৫ : ৬

		স	গ	প		
১৬	২০	২৪	৩০	৩৬	৪৫	৫৪
ম	ধ	স		প	ন	র্র
৪ :	৫ :	৬		৪ :	৫ :	৬

স : গ : প, স : প, ম : গ, ম : প বা এইরূপ অনুপাতযুক্ত স্বর আমরা অনেক পাই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণ এইরূপ সুরের একত্রিত ধ্বনিকে কর্ড (chord) বলেন। বাংলাতে স্বরসন্ধি বা স্বরসম্বাদ বলা হয়। কর্ডগুলির উপযুক্ত ব্যবহারকে পাশ্চাত্য দেশে হারমোনি (harmony) বলা হয়। এই হারমোনিই পাশ্চাত্য দেশীয় সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন।

হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসম্বাদ

প্রকৃতপক্ষে, নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বুঝা যায়, কর্ডগুলির উপযুক্ত ব্যবহার আমাদের রাগরাগিণীতে সুন্দর ভাবে হয়, তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণ ইহার উপর যেরূপ জোর দিয়া থাকেন, আমরা তেমন দিই না। সূক্ষ্ম স্বর-অন্তরগুলির আবেগভরা অনুরণনগুলিই আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্য। সঙ্গীতে দুইটি জিনিষ,—একটি মেলোডি ও অপরটি হারমোনি। আমাদের সঙ্গীত মেলোডি-প্রধান।

আমাদের সঙ্গীতের বাদী-সংবাদীর মিলনই প্রকৃত স্বরসম্বাদ। একটা রাগরাগিণীতে যদি গ-কে প্রবল করি তবে তাহার পঞ্চম সুর ন-কে প্রবল করিতেই হয়। না হইলে রাগআলাপন প্রাণমাতান হয় না। গ-কে স ধরিলে ন তাহার পঞ্চম হয়। কাজেই এখানে স : প অনুপাত।

এখানে ইমন্ দিয়া বুঝান যাক—সঃ নঃ—ঃ ধঃ পঃ মীঃ-ঃ গঃ-ঃ-ঃ গমীঃ পঃ নঃ-ঃ ধঃ পঃ মীঃ গঃ-ঃ রঃ নঃ রঃ গঃ-ঃ রঃ নঃ রঃ সঃ-ঃ।

ইমন্ রাগিণীর স্বরবিন্যাসের এই টুক্‌রা হইতেই দেখা যায় যে, প্রথম স হইতে ন-কে একটু প্রবল করিয়া গ-কে প্রবলতর করা হইতেছে ও গ হইতে প্রায় লাফ দিয়া ন-তে গিয়া ন-কে প্রবল করিতেছে। এই স্থানটির মাধুর্য্য সুন্দর। আবার গঃ—ঃ রঃ নঃ রঃ গঃ-ঃ রঃ নঃ রঃ সঃ-ঃ স্থানটিতে বারে বারে গ হইতে খাদ ন-তে গিয়া আমাদের প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছে।

বেহাগ রাগিণীর সঃ—ঃ-ঃ গঃ-ঃ মঃ পঃ-ঃ-ঃ নঃ-ঃ নঃ সঃ-ঃ সঃ নঃ-ঃ নঃ পঃ মীঃ পঃ ...

এইটুকু আমাদের মন যেমন উদাস করিয়া তুলে এমন আর অন্য রাগ-

রাগিণীতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এখানে আমরা স-গ প-ন দুইটি কর্ড সুন্দর পাইতেছি। স হইতে গ-তে বা প হইতে ন-তে মীড়যোগে আরোহণ-অবরোহণ করিলেই প্রাণে সুধা বর্ষিত হয়।

আবার আমরা যখন এক সুর হইতে কিছু দূরে আরোহণ বা অবরোহণ করি, আমরা হয় সেই সুরের পঞ্চম সুরে, চতুর্থ সুরে বা তৃতীয় সুরে, অর্থাৎ সুরের মিল যে-সব সুরে আছে সেই সব সুরেই যাই। ইহাই আমাদিগকে আনন্দ দেয়।

সাধারণতঃ রাগরাগিণীর অন্তরাতে ম বা প হইতে ন বা স সুরে যাওয়াই বিশেষত্ব। প হইতে ন সুরের অনুপাত ৪ : ৫। বাগেশ্রী রাগিণীতে

সঃ রঃ মঃ পঃ ধঃ নোঃ সঃ রঃ গোঃ—ঃ রঃ সঃ নোঃ-ঃ ধঃ পঃ নোঃ—ঃ গোঃ —ঃ মঃ রঃ সঃ-ঃ। এখানে নো হইতে গো-তে লাফাইয়া গেলে বাগেশ্রী মধুর হয়। নো সুর গো-এর পঞ্চম বা গো বাদী হইলে নো সংবাদী হয়। দুই সুরে এইরূপ মিল আছে বলিয়াই দুইটি সুর একত্র ধ্বনিত হইলেই মাধুর্য্য এইরূপ বাড়িয়া উঠে। যে-যে সুরের সঙ্গে যে-যে সুরের মিল আছে ঐ সব সুর গীতে ধ্বনিত করিয়া আমরা রাগরাগিণীর মাধুর্য্য বাড়াইয়া থাকি। ইহাই হিন্দুসঙ্গীতের প্রকৃত স্বরসম্বাদ।

দশম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতে ভাব

গীত-রস — সঙ্গীত একটা ললিত-কলা। কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ইত্যাদিও ললিত-কলা। ললিত-কলায় নানাবিধ রস সৃষ্টি করিতে হয়। নয় প্রকার রস আছে। যেমন—

শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়
করুণ, অদ্ভুত, শান্তি, এই রস নয়॥
—রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র

আদি রস, হাস্য রস, বীভৎস বা ঘৃণাসূচক রস, করুণ, ভয়, বীর রস, অদ্ভুত বা বিস্ময়জনক রস এবং শান্তরস এই নয়প্রকার রস গীত, বাদ্য বা নৃত্যে আবির্ভূত করিতে হয় বলিয়াই সঙ্গীত ললিত-কলা।

মানুষ অন্যের নিকট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বা অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইয়া সুখানুভব করে। একজন করুণ ভাবে কথা বলিলে শ্রোতার মনেও করুণ ভাব জাগিয়া উঠে। কাব্যে কোন স্থানে করুণ রসাত্মক অভিব্যক্তি থাকিলে পাঠকেব মনকেও করুণ ভাবাত্মক করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এইরূপ আমাদের ভাবসৃষ্টিই আমাদের সঙ্গীতের ধর্ম্ম।

সঙ্গীতাচার্য্যগণের মতে এক-একটি সুর এক-এক ভাব উৎপন্ন করে। তাঁহারা বলেন—

সা—সকল ভাব প্রকাশ করে; ইহা বিশ্রামের সুর।
রে—করুণ ও অনেক সময় উৎসাহসূচক।
গা—শান্তিপ্রদ।
মা—নিরাশা বা ভয়সূচক সুর।
পা—বীর ও উত্তেজক।
ধা—করুণ শোকসূচক সুর।

নি—রৌদ্র, বীর ও প্রদর্শক সুর।

স সুরে আসিয়া আমরা বিশ্রাম করি। গ্রামের অন্যান্য সুরগুলি হইতে আরোহণ-অবরোহণ করিয়া আসিয়া সঃ সঃ নরঃ সঃ -ঃ -ঃ। উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যাই। তখন আর অন্য সুরে যাওয়ার ইচ্ছা করে না।

কানড়ায় মঃ পঃ নোঃ ধোঃ নোঃ—ঃ সঃ-ঃ সঃ নোঃ সঃ রঃ-ঃ সঃ নোঃ সঃ –রঃ -ঃ -ঃ ইত্যাদি স্বরবিন্যাসের উৎসাহসূচক সুর বলিয়া মনে হয়। রঃ নোঃ—ঃ ধঃ পঃ মঃ গঃ রঃ-ঃ ইত্যাদি দেশরাগিণীর স্বরবিন্যাসে র সুর করুণ ভাব ব্যক্ত করে।

সঃ রঃ সঃ রঃ গঃ—ঃ গ-ঃ মঃ গঃ রঃ-ঃ গঃ-ঃ গঃ—ঃ। এইরূপ স্বরবিন্যাসে গ শান্ত রসাত্মক।

সঃ—ঃ গঃ মঃ পঃ-ঃনঃ -ঃ সঃ -ঃ নঃ -ঃ পঃ মীঃ পঃ মঃ -ঃ গঃ-ঃ মঃ পঃ -ঃ মঃ গঃ -ঃ সঃ -ঃ -ঃ। এখানে ম সুর নিরাশাসূচক উদাস-করা ভাব-প্রকাশ করিতেছে।

সঃ পঃ—ঃ মঃ গঃ —ঃ গমঃ পঃ ঃ পঃ। এখানে প সুরে দাঁড়াইতেই মন উত্তেজিত হইয়া উঠে বলিয়া বোধ হয়।

সঃ রঃ গঃ পঃ -ঃ ধঃ -ঃ ধঃ -ঃ এইরূপ ভাবে ধ সুরে আসিলে শোকসূচক করুণ ভাব আসিয়া থাকে।

ন উচ্চারণ করিলেই স উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হয়। এই জন্যই ন-কে প্রদর্শক সুর বলা হইয়াছে।

সঙ্গীতে ভাব

যাহা হউক, গায়কের মনের অবস্থা যখন যেমন থাকে সুরেও তদনুযায়ী ভাব আসে। এমন কি, উপরের সুরগুলিকে যেরূপ রসব্যঞ্জক ধরা হইয়াছে, গায়কের মনের ভাবভেদে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়। সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে, রাগরাগিণীগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। হিন্দোলে হৃদয়ে বসন্তের ভাব আসে, মল্লারে বর্ষার ভাব আসে। কিন্তু তাহা প্রমাণ করা যায় না। এই জন্য আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। বর্ষাকালে মানুষের

স্নায়ুমণ্ডলে কিরূপ স্পন্দন আন্দোলন হয়, তাহা যদি কোন বিজ্ঞানাচার্য্য আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে হয় ত ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মল্লারে বর্ষার ভাব আসে। বর্ষাকালে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে যেরূপ স্পন্দন আন্দোলন হয়, মল্লার রাগিণী শুনিয়া মানুষের স্নায়ুতে যদি ঠিক সেইরূপ স্পন্দন হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, মল্লারে মানবহৃদয়ে বর্ষার ভাব আসে। যাহা হউক, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান জিনিষ ভাব। আমাদের হিন্দুসঙ্গীতে বিশ্বের ভাব ব্যক্ত করে এবং ইহাই তাহার বিশেষত্ব।

পুষ্প-কল্পনা* স্বর-উৎপত্তি ও বর্ণ-উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুইটিতে একটা সুন্দর সাদৃশ্য আছে। স্বর-উৎপত্তিতে দেখান হইয়াছে যে, এক ধ্বনি হইতেই সবগুলি সুরের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার শুভ্র জ্যোতির মধ্যে সকল বর্ণ ই দেখা যায়। সূর্য্যের রশ্মি সাতটি বর্ণের সমষ্টি।

"শুভ্র জ্যোতির মধ্যে সকল বর্ণ ই লীন।
ঈশ্বর ভক্তির মধ্যে সকল ভাবই লীন।
শুদ্ধ ধ্বনির মধ্যে সকল সুরই লীন।"

সাত সংখ্যাটিই পবিত্র বলিয়া অনেকে মনে করেন। সূর্য্যের আলোক সাতটি বর্ণের সমষ্টি। সাতটি সুরের সমষ্টি সপ্তক। সাত বারে এক সপ্তাহ। সাতটি গ্রহ। সমস্তই প্রায় সাত সংখ্যায়।

যাহা হউক, সুরগুলির মধ্যে আমরা স নির্দ্দিষ্ট করিয়া প ও গ প্রথমেই পাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, স, গ ও প এই তিনটি সুর প্রধান। স মূল সুর এবং ইহার পরেই প ও গ-এর স্থান।

সাতটি বর্ণের মধ্যে আমরা রক্ত, পীত ও নীল এই তিনটিই প্রধান দেখিতে পাই। এই তিনটি বর্ণের সাহায্যে আমরা সাতটি বর্ণ পাইতে পারি। আবার পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখান হইয়াছে যে, স, গ ও প এই তিনটি

সাতটি সুরের বর্ণ সুরের সাহায্যে সাতটি সুরই পাইতে পারি। স, গ, প সুরত্রয়কে যদি

---

* শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন।

রক্ত; পীত ও নীলবর্ণ ধরা যায়, তবে অন্যান্য সুরগুলি কি বর্ণের হয় তাহা দেখা যাক্।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, দুইটি সুরের কম্পন-সংখ্যা একত্র করিয়া আমরা এক-একটি সুর পাইয়াছি। যথা—

$$\frac{\text{স}+\text{গ}}{২} = \text{র} \qquad \frac{২৪+৩০}{২} = ২৭ = \text{র}$$

স-কে রক্ত, গ-কে পীত, প-কে নীলবর্ণ ধরিয়া লইলে র সুর কি বর্ণের হয় দেখা যাউক।

$$\frac{\text{স}+\text{গ}}{২} = \text{র}\text{; রক্ত}+\text{পীত} = \text{র}\text{; কমলা} = \text{র।}$$

এইরূপে—ম = গ + প

ম = পীত + নীল

ম = সবুজ

আবার—ন = প + র

ন = নীল + কমলা

ন = বেগুনী

ধ = প + ন

ধ = নীল + বেগুনী

ধ = অতি নীল (প্রায় কাল)

অতএব সাতটি সুরের বর্ণ আমরা পাইতেছি।

ধ্বনি = শ্বেত

স = রক্ত

র = কমলা (গোলাপী)

গ = পীত

ম = সবুজ

প = নীল

ধ = অতি নীল (কাল)

ন = বেগুনী

ভৈরবী ও পদ্ম

এখানে ভৈরবী রাগিণীকে আমরা কোন ফুলের সঙ্গে বা কিরূপ ফুলের সঙ্গে কল্পনা করিতে পারি দেখা যাউক।

সঃ ধোঃ—ঃ ধোঃ নোঃ—ঃ ধোঃ পঃ মঃ গোঃ মঃ—ঃ গোঃ রোঃ—ঃ সঃ সঃ রোঃ গোঃ মঃ—ঃ মঃ—ঃ গোঃ—ঃ রোঃ সঃ—ঃ

ইহা ভৈরবীর স্বরবিন্যাস। ইহাতে সব কয়টি সুরই ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা পাইয়াছি যে, শ্বেতবর্ণে সব কয়টি বর্ণই আছে।

"সঃ রোঃ গোঃ মঃ—ঃ মঃ" হইতে ম-এর প্রাধান্য বুঝিতেছি। ম সবুজ।

আবার—প ধো নো সং

স রো গো ম কাজেই এখানে, স আর প একই প্রকার। অতএব রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ যে-কোন একটা বর্ণ ধরা চলে। ধোঃ‿গোঃ—ঃ রোঃ সঃ—ঃ নোঃ ধোঃ পঃ—ঃ গোঃ পঃ—ঃ মঃ ধোঃ পঃ—ঃ মঃ গোঃ রোঃ সঃ—ঃ এখানে রো সুর ও স সুরের মিশ্রিত ধ্বনিতে আমরা সুখানুভব করি। রো গোলাপী।

রো সুরের মত ধো-ও আমাদের হৃদয় আন্দোলিত করে। ধো—গাঢ় নীল। ধোঃ‿গোঃ-এর আরোহণ মধুর হইয়া কানে বাজে।

পঃ—ঃ মঃ গোঃ—ঃ রঃ গোঃ—ঃ সঃ গোঃ—ঃ রোঃ সঃ—ঃ —ঃ অথবা সঃ নোঃ ধোঃ —ঃ নোঃ সঃ—ঃ গোঃ—ঃ—ঃ মঃ গোঃ—ঃ এখানে গো মধুর। গো পীত।

দেখা যায়, সবুজ বর্ণের মধ্যে শ্বেত, পীত, গোলাপী, নীল বর্ণের ফুলের সঙ্গে কল্পনা করা চলে। ভাবের কথায় সবুজ বা তদনুরূপ বর্ণের পাতাযুক্ত লতায় বা গাছে শ্বেতবর্ণের ফুল—পীতাভাযুক্ত। এখানে পীতাভা কোরক-

বিশিষ্ট শ্বেতপদ্ম, গোলাপীপদ্ম বা নীলপদ্মও হইতে পারে। রাত্রির নির্ম্মল বায়ুতে প্রস্ফুটিত পদ্ম জাতীয় ফুলের সঙ্গে ভৈরবী রাগিণীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সকাল বেলা ভৈরবী রাগিণীর আলাপ শুনিলে মনে হয়, এ যেন একটা সকাল বেলার পদ্মফুলের তোড়া।

এইরূপ প্রতি রাগরাগিণীকেই ফুল বা ফুলের তোড়ার সঙ্গে কল্পনা করা চলে।

রাগরাগিণীর বিভাগ

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থকারগণ রাগরাগিণীগুলিকে একটি বিরাট পরিবারে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বিভাগ, ইহাতে মনে হয় প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ কল্পনাতেই এইরূপ বিভাগ করিয়াছিলেন। রাগকে পুরুষ জাতীয় ও রাগিণীকে স্ত্রী জাতীয় বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আবার পুত্র (উপরাগ) ও পুত্রবধূ (উপরাগিণী) ও তাহাদের সখাসখী এইরূপ বহু-বিধ বিভাগ দেখা যায়।

কথিত আছে, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। কিন্তু ইহাতেও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্রহ্মা, ভরত, হনুমন্ত ও কল্লিনাথ এই চারি জনের চারি মত এই দেশে প্রচলিত। ব্রহ্মা ও কল্লিনাথ মতে ভৈরব, শ্রী, বৃহন্নট, দীপক, বসন্ত ও মেঘ এই ছয় রাগ। আর ভরত ও হনুমন্ত মতে ভৈরব, শ্রী, দীপক, মেঘ, মালকোশ ও হিন্দোল। ব্রহ্মা ও কল্লিনাথ মতে রাগবিভাগে সম্পূর্ণ ও খাড়ব জাতীয় রাগই ধরা হইয়াছে। ঔড়ব জাতীয় রাগ ধরা হয় নাই। কিন্তু হনুমন্ত ও ভরত মতে দুইটি সম্পূর্ণ, দুইটি খাড়ব, দুইটি ঔড়ব রাগকে রাগ বলা হইয়াছে। এখানে সুন্দর নিয়ম রহিয়াছে। হিন্দুস্থানে হনুমন্ মত মানিয়া থাকেন। আবার কল্লিনাথের মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। কিন্তু হনুমন্ মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণী। কোন্ কোন্ রাগিণী কোন্ কোন্ রাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে প্রাচীন চারি মতই বিভিন্ন। ইহাতে এই মনে হয় যে, এই শ্রেণীবিভাগের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু অনেকেরই এই বিভাগ জানিবার জন্য আগ্রহ আছে বলিয়া এখানে ব্রহ্মার মত ও হনুমন্ত মত দুইটি মতই দেওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মার মতে—

ভৈরব—ভৈরবী, রামকেলী, গুর্জ্জরী, গুণকেলী, বঙ্গালী ও সৈন্ধবী (সিন্ধু)।
শ্রী—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, বঙ্গালী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী।
নট-নারায়ণ—কামোদী, আভেরী, কল্যাণী, নাটীকা, সারেঙ্গী ও হাম্বিরা।
বসন্ত—হিন্দোলী, ললিতা, দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী ও টোড়ী।
মেঘ—মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী ও কৌশকী।
দীপক—ভূপালী, বিভাষা, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

হনুমন্ত মতে—

ভৈরব—ভৈরবী, বৈরাটী, বঙ্গালী, মধুমাধবী ও সৈন্ধবী।
শ্রী—মালবী, মালশ্রী, ধানশ্রী, বাসন্তী, আশাবরী।
মালকৌশ—টোড়ী, গৌরী, গুণকেলী, খাম্বাবতী ও কুকুভা।
হিন্দোল—রামকেলী, ললিতা, দেশাঙ্গী, বেলাবলি ও পটমঞ্জরী.
মেঘ—টঙ্কা, সৌরটী, গুর্জ্জরী, ভূপালী ও দেশকিরী।
দীপক—দেশী, কামোদী, নাটীকা, কেদারী ও কর্ণাটীকা।

প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ রাগরাগিণী গাহিবার ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ওস্তাদদের মধ্যে তাহা বিশেষভাবে প্রচলিত। কোন্ কোন্ রাগরাগিণী কোন্ কোন্ সময়ে গাহিতে হয় নিম্নে তাহা দেওয়া যাইতেছে।

দিবা প্রথম প্রহরে গেয়—ভৈরব, রামকেলী, যোগিয়া ভাটিয়ারী, কালিঙ্গড়া, বঙ্গালী, মঙ্গল, ভৈরবী, বিভাস ও দেশকার।

দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়—গুর্জ্জরী, আশাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী, খট, গুণকেলী, আলাহিয়া, কুকুভ, দেবগিরি, সরফর্দ্দা, বেলাবলী, শুক্ল-বেলাবলী, গৌড়-সারঙ্গ, বৃন্দাবন-সারঙ্গ।

দিবা তৃতীয় প্রহরে গেয়—ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, মূলতান।

দিবা চতুর্থ প্রহরে গেয়—পূরিয়া, মারওয়া, জয়ন্ত, সাজগিরি, কুমারী, মালশ্রী, মালবী, ধানশ্রী, জৈশ্রী, ত্রিবণী, বৈরাটী।

দিবা-রাত্রির সন্ধিকালে—শ্রীরাগ, পূরবী, গৌরী।

রাত্রি প্রথম প্রহরে—ইমন্, কল্যাণ, ইমন্‌কল্যাণ, ভূপালী, হাম্বির, কেদারা, শ্যাম, ছায়ানট, নট-নারায়ণ, কামোদ, নিশাসাগ, দেওসাগ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে—দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী, সাহানা, আড়ানা, সিন্ধু, কাফি, সিন্ধুড়া, কাফিসিন্ধু, মুখারী, সরস্বতী, বাহার, জয়জয়ন্তী, গোড়মল্লার, মিয়ামল্লার, সুরট, দেশ, মেঘ, তিলককামোদ, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, লুম, মালকোশ, চন্দ্রকোশ, দীপক, পরজ, পিলু, বারঁওয়া, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, বেহাগ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে—হিন্দোল, বেহাগড়া।

রাত্রি চতুর্থ প্রহরে—সোহিনী।

রাত্রি ও দিবার সন্ধিকালে—ললিত।

ছয়টি ঋতুতে ছয়টি রাগ গাহিবার নিয়ম কাছে। যথা—গ্রীষ্মকালে—দীপক, বর্ষায়—মেঘ, শরতে—ভৈরব, হেমন্তে—মালকোশ, শীতকালে—শ্রীরাগ এবং বসন্তে—হিন্দোল।

প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যে-কোন সময়ে যে-কোন রাগিণী আলাপ করিতে পারে।